প্রকাশকের নিবেদন।

এই পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠাতে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর বাহাদুর লিখিয়াছেন—"আত্মার নিত্যত্ব-সমর্থন সাধারণতঃ তিনটি পথ অবলম্বন করিয়া করা হইয়া থাকে। (১) ধর্ম্মগ্রন্থ বা ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠাতার উক্তিদ্বারা, (২) দার্শনিক যুক্তি দ্বারা, (৩) জনসমাজে প্রেতের অনুষ্ঠিত অলৌকিক কার্য্যাদি সন্দর্শন দ্বারা।" প্রথম দুই বিষয়ের আলোচনা এই খণ্ডে করা হইয়াছে। তৃতীয় বিষয় সম্বন্ধে কিছুই এপুস্তকে বলা হয় নাই। গত তিন বৎসর যাবৎ এদেশের, ইংলণ্ডের এবং আমেরিকার নানা সংবাদপত্র হইতে ভূত-প্রেতের নানা আখ্যায়িকা যখন যাহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহা তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রেততত্ত্ব বিষয়ক কতকগুলি মূল্যবান্ ইংরাজী ও আমেরিকান পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নানা পুরাণ হইতে পুরাণ-বর্ণিত অনেক প্রেতের আখ্যায়িকাও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। পুস্তক লিখিবার এই সকল উপাদান সংগৃহীত থাকা সত্ত্বেও রাজা বাহাদুর অবশিষ্টাংশ লিখিয়া শেষ করিতে পারিলেন না—কারণ; ইহাতে যতটুকু পরিশ্রম করিবার দরকার, রাজাবাহাদুর ভগ্নস্বাস্থ্য ও জরাজীর্ণ-দেহে ততটুকু পরিশ্রম করিবারও এখন

আর সামর্থ্য রাখেন না। এই খণ্ডের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—"পুরাণ হইতে পরলোকের অবস্থাঘটিত সেই সকল উপাদেয় তথ্য সযত্নে সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল।" মহামণ্ডল প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ রাজা বাহাদুরের পৌত্র শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের প্রতি তিনি ইহার শেষাংশ প্রকাশ করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন। ভূত-প্রেত-ঘটিত নিজপ্রত্যক্ষীভূত কোন বিষয়ের বিবরণ, কোন পাঠক আমার নিকট সংক্ষিপ্ত ভাষাতে লিখিয়া পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে এবং তিনি তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে সানন্দে সন্নিবেশ করিবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মা—

প্রকাশক।

পরকাল-তত্ত্ব

কাল—এক এবং অখণ্ড; আর সেই অখণ্ডকাল—অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অপরিমেয়। অর্থাৎ কালের এক অংশকে তাহার অন্য অংশ হইতে কেহ পৃথক করিতে পারে না, কালকে কেহ বিভাগ করিতে পারে না, কেহ উহার পরিমাণও অবধারণ করিতে পারে না। ঘটস্থিত আকাশকে মহা-আকাশ হইতে পৃথক করিয়া যেমন আমরা 'ঘটাকাশ' বুঝিতে চেষ্টা করি, অথবা সিন্ধু হইতে এক বিন্দু জল তুলিয়া লইয়া অঙ্গুলির অগ্রে রাখিয়া, ঐ জলবিন্দুকে সমুদ্র হইতে আমরা যেমন পৃথক করিতে পারি, কালের কোন এক অংশকে কাল হইতে তেমন পৃথক করিতে আমাদের শক্তি নাই। তবে যে—দিবা, রাত্রি, বার, তিথি, সপ্তাহ, পক্ষ, শরৎ বসন্তাদি ষড়্ ঋতু, বৎসর, যুগ, কল্পাদি নানা নাম দিয়া অখণ্ড কালকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমরা বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি, ইহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে কালের বিভাগ বলা চলে না; এই সকল কথাতে কেবল আমাদের স্থূল জগতের অবস্থা পরিবর্ত্তন ব্যাপারের বোধ-পরিজ্ঞাপক কতকগুলি মন-কল্পিত সংজ্ঞা কালের উপরে আরোপ করিয়া রাখা হইয়াছে, বুঝিতে হয়। এই বিশ্ব-সংসারে, পথ-পার্শ্বের

ক্ষুদ্র দূর্ব্বা ঘাসের মূল প্রসারণ কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া নভোমণ্ডলে স্থিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিক্রমণ কার্য্য পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত একটা পরিবর্ত্তনের বিশাল প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে। জড় এবং চেতন সকলের মধ্যেই সর্ব্বক্ষণ একটা পরিবর্ত্তন সংঘটন হইতেছে। এই বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তন-প্রবাহ, সূর্য্যের উদয়াস্তকে আশ্রয় করিয়া আমরা সাধারণত বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। রেল-গাড়ীতে বসিয়া—সুদূরস্থিত বৃক্ষ, নদী, বাড়ী, ঘরাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া—আমরা যে দ্রুতবেগে চলিয়াছি তাহা যেমন বুঝিতে পারি, তেমনি সূর্য্যের উদয়াস্ত ঘটিত প্রাকৃতিক একটা স্থূল পরিবর্ত্তনের দিকে চক্ষু রাখিয়া — অর্থাৎ দিন গণিয়া, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বা সমাজগত উন্নতি-অবনতির বা রাষ্ট্রীয় অবস্থা ঘটিত ভাল মন্দ পরিবর্ত্তনের পরিমাপ বুঝিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। সূর্য্যের উদয়াস্তকে মাপের ফিতার এক একটি রেখা মনে করিয়া, আমরা আমাদের সাংসারিক কার্য্যের সুবিধা বিধানার্থে মাস, বৎসর, শতাব্দি ইত্যাদি এক একটা সংজ্ঞা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া দিয়াছি মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের কার্য্যের পরিমাপের জন্যই এই সকল শব্দ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইয়াছে—কালের পরিমাপের জন্য নহে এবং আমাদের কার্য্যের সহিতই এই সকল সংজ্ঞার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে; কালের—দিবা, রাত্রি, মাস, বৎসর, যুগ, কল্প ইত্যাদি কিছুই নাই। যাহার আদি নাই, যাহার অন্ত নাই, যাহার

মধ্যস্থান নির্ণয় করিবারও কোন উপায় নাই, যাহার ভিতরে কিছু রাখিয়া একাংশ হইতে অন্যাংশকে পৃথক করিয়া বুঝিবারও কোন পন্থা নাই, যাহার অংশ, কলাদি ভাগ বিভাগ কিছুই নাই, এ হেন অখণ্ড মহাকালের অশরীরী অঙ্গের সঙ্গে "অতীত" "বর্ত্তমান" বা "ভবিষ্যৎ" ইত্যাদি ভেদভাব বোধক অবস্থাও কখনও সংযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। এই দৃষ্টিতে, "ইহকাল" ও "পরকাল" শব্দও মহাকালের সহিত এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিজড়িত হইয়া থাকিতে পারে না। অর্থাৎ মহাকালের ইহকালও নাই, মহাকালের পরকালও নাই। তবে আমাদের যে—এ দুইই আছে, তাহা সুনিশ্চিত। মূলে যাহা নাই, আমরা কি ভাবে তাহা পাই? আমাদের মধ্যে কি ভাবে তাহা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে? কি প্রণালীর চিন্তাকে অনুসরণ করিয়া কালের স্বরূপ তথা পরকালের অস্তিত্ব আমরা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি এবং তাহা উপলব্ধি দ্বারা আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি লাভের সম্ভাবনা আছে? এই প্রস্তাবে এই সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

স্থূলদৃষ্টিতে, সাধারণত প্রায় সকলেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে—"যাহাতে যে বস্তু নাই, তাহা হইতে উহার উদ্ভব হওয়া আদৌ সম্ভবে না।" তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য তাঁহারা এই প্রণালীর যুক্তি উপস্থিত করিয়া

থাকেন যে,—পাথরে মধু নাই, সে জন্য এক খণ্ড পাথর লইয়া বহু বৎসর যাবৎ তাহাকে নিরন্তর টিপাটিপি করিলেও ঐ পাথর খণ্ড হইতে কখনই এক বিন্দু মধুও নিষ্কাশন করা যাইতে পারে না। এইরূপ যুক্তি ধরিয়া কেহ কেহ আবার পরকাল বলিয়া যে একটা কিছু থাকিতে পারে এবং সেই পরকালে স্বর্গ নরকাদি ভোগের কোনরূপ সম্ভাবনা আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে চাহেন। আস্তিক হিন্দুগণ, আর এক প্রণালীর চিন্তাসূত্র ধরিয়া অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—ব্রহ্ম সৎ, অথচ উহা হইতে এই অসৎ—বিশ্ব-সংসারের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মে "অসৎ" বা মিথ্যা বলিয়া কোন বস্তু নাই, অথচ এই মিথ্যা জগৎ সেই সৎ হইতেই সমুৎপন্ন। আমাদের বেদান্ত-শাস্ত্রের এই জটিল ও বিশালতত্ত্ব আমাদের ন্যায় সাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে ধারণা করিতে অসমর্থ, এজন্য বেদ-বেদান্তের এই সকল উচ্চ কথার বিস্তারিত আলোচনা ত্যাগ করিয়া আর একটা ক্ষুদ্র লৌকিক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সূর্য্যমণ্ডল সর্ব্বদা প্রদীপ্তমান, নিরন্তর উহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে অজস্র রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে, এজন্য সূর্য্যে দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা, বা প্রত্যুষ নাই; অথচ এই সূর্য্যই আমাদের উপভোগ্য দিবা-রাত্রির জন্মদাতা। যে বস্তু যাহাতে নাই, তাহা হইতেও যে ঐরূপ—না থাকা বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা এই ঘটনা

হইতেই সপ্রমাণিত হইতেছে। আর একটা বিষয় লইয়া আর একটু চিন্তা করিতে বাধা নাই। হিমালয় হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া গঙ্গা, সুবিস্তৃত ভারতের নানা স্থান অতিক্রম করিয়া, অবশেষে সাগরে যাইয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। একটা এয়ারোপ্লেনে বা ব্যোমযানে চড়িয়া, আকাশের অতি উচ্চস্থানে উঠিয়া তথা হইতে যদি সম্পূর্ণ গঙ্গাকে একযোগে আমাদের দৃষ্টিপথে আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলে তখন সম্পূর্ণ গঙ্গা ভারতবক্ষে একটি শুভ্র যজ্ঞসূত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকিবে, তখন আর আমাদের নিকটে গঙ্গার "উজান" বা "ভাটি" ইত্যাদি কিছুই থাকিবে না; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা ব্যোমযান হইতে নামিয়া গঙ্গাজলে আকণ্ঠ-দেহ নিমজ্জিত করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন আমাদের দৃষ্টিপথের একদিকে গঙ্গার উজান স্রোত ও অন্যদিকে ভাটিস্রোত উপলব্ধি হইতে থাকিবে। গঙ্গা-স্রোতের যে ভাগ হিমালয়ের দিক হইতে আমাদিগের দিকে চলিয়া আসিতেছে তাহাকে "উজান" এবং আমাদের স্থিতি স্থানকে অতিক্রম করিয়া যাহা সাগরমুখে চলিয়াছে তাহাকেই "ভাটি" স্রোত বলিয়া আমরা আখ্যা দিয়া থাকি। প্রকৃত প্রস্তাবে একই ভাবে প্রবাহিতা গঙ্গা ধারার উজান বা ভাটি স্রোত না থাকিলেও আমাদের দাড়াইবার স্থানের গুণে—আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে যেমন গঙ্গার উজান ও ভাটি প্রতিভাত হইতে থাকে, সেইরূপ মহাকালের মহা-ধারার উজান-ভাটি অর্থাৎ "অতীত" "ভবিষ্যৎ" ভেদ কিছু

মাত্র না থাকিলেও, আমাদের দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে, আমাদের চিত্তে ঐরূপ "অতীত" কাল বা "ভবিষ্যৎ" কাল নামধেয় একটা জ্ঞান উদ্‌ভাবিত হইয়া উঠে। চক্ষুর সম্মুখস্থ আকাশে একবার সূর্য্যের দিকে এবং আরবার আমাদের চারি পার্শ্বে চাহিয়া যেমন আমরা "অদ্য" সম্বন্ধীয় একটা জ্ঞান উপলব্ধি করি, আর এইরূপ আর একটা দিন যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া—তাহাকে "গতকল্য" স্থির করি, এবং এইরূপ আর একটা দিন আসিতেছে—চিন্তা করিয়া যেমন তাহাকে "আগামী কল্য" বলিয়া সিদ্ধান্ত করি, সেইরূপ এই চিন্তাসূত্রকে টানিয়া আর একটু লম্বা করিয়া আমাদের জীবনের অতীত ঘটনার স্মৃতিকে লইয়া "অতীত কাল" এবং সম্ভাবিত ঘটনার চিন্তাকে ধরিয়া "ভবিষ্যৎ কাল" এবং উপস্থিত ব্যাপার সকলকে অবলম্বন করিয়া "বর্ত্তমান-কাল" আমরা নির্ণয় করিয়া থাকি। যে জগতে সূর্য্যের উদয় দেখিবার আদৌ উপায় নাই, সে জগতে—কাল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও "গতকল্যের" "অদ্যের" এবং "আগামী কল্যের" অস্তিত্ব নাই। এই ভাবে যে স্থানে জীবের কোন রূপ ক্রিয়া সম্পাদনের সামর্থ্য নাই,—অর্থাৎ কার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা কালকে পরিমাপ করিবার আদৌ কোনরূপ সুবিধা ও সম্ভাবনা নাই. তেমন স্থানে অবস্থিতি করিয়া, কাল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেরূপ জীবের পক্ষে "অতীত-কাল" "বর্ত্তমান কাল" এবং "ভবিষ্যৎ-কাল" বলিয়া কিছু হৃদয়ে ধারণা করিতে

পারিবারও উপায় নাই। ফলতঃ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের জ্ঞান আমাদের চিত্তে উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের পরকালের ধারণাটীও আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—জীবের জন্মান্তর গ্রহণরূপ কর্ম্ম যখন নিবৃত্ত হয়, যখন নির্ব্বাণ প্রাপ্তির দশাতে আসিয়া জীব উপস্থিত হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার "পরকাল"ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ কথাতেও আমাদের "কর্ম্ম"কে আশ্রয় করিয়াই যে আমরা কালের অঙ্গে "ভূত", "ভবিষ্যৎ", "বর্ত্তমান" আদি বিশেষণ বোধক শব্দগুলি এবং তাহারই আর একটা ভাবান্তর "ইহকাল", "পরকাল" ইত্যাদি কথাগুলি জড়াইয়া রাখিয়া দিয়াছি, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু এ সকল যে 'খাম-খেয়ালি' ভাবে কালের অঙ্গে চাপাইয়া রাখা হয় নাই, প্রত্যুত, বিশেষ হেতু-মূলে, বহু গবেষণার ফলে এবং মানবীয় চিন্তা-চক্ষুর সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি শক্তির বলে উহার সারবত্তা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা গিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ।

অবস্থান-ক্ষেত্রের তারতম্যানুসারে, একই বস্তুকে মানুষে বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন প্রকারে এবং বিচিত্ররূপে, দেখিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে এই কাশী-নগরীর কথাই উল্লেখ করা যাউক। গঙ্গার পরপারে রামনগরের ঘাটে বসিয়া কাশীকে দেখিতে উপস্থিত হইলে একরূপ দেখাইবে, কাশীস্থ অত্যুচ্চ

"বেণীমাধবের ধ্বজা" বা চূড়ার উপরে উঠিয়া কাশীকে আবার দেখিতে থাকিলে তখন আর এক মূর্ত্তিতে কাশী-নগরী দর্শকের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইবে, রাজঘাটের লৌহ-সেতুর উপরে দাঁড়াইয়া কাশীকে দেখিলে উহার অন্যবিধ চিত্র দর্শকের নয়নে প্রতিফলিত হইবে। দ্রষ্টব্যস্থান—একই কাশী নগরী, দর্শক একই ব্যক্তি এবং একই দিনে উহার দর্শন কার্য্য নিষ্পন্ন করা হইতেছে, তৎসত্ত্বেও কেবল তিনটি পৃথক স্থান হইতে দেখিবার ফলে সম্পূর্ণ পৃথক্ তিন মূর্ত্তিতে কাশী-নগরী দর্শকের চক্ষু সম্মুখে বিভাসিত হইতেছে, ইহা দ্বারা দর্শকের অবস্থান-ক্ষেত্রেরই মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে। কাল সম্বন্ধেও ঐ একই কথা; যাঁহার অবস্থান স্থান যত উচ্চে এবং যাঁহার চিন্তাচক্ষুর দৃষ্টিক্ষেত্র যতদূর প্রসারিত, তিনি—ততই বৃহদাকারে তাঁহার জীবনের অতীত ঘটনা এবং ভাবী ঘটনাবলীর সুবৃহৎ মানচিত্র তাঁহার নেত্র-সম্মুখে খুলিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিয়া থাকেন। যাঁহার অন্তশ্চক্ষুর দৃষ্টি আরও প্রসারিত, তিনি নিজ-জীবনের ঘটনার সীমাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার সমাজের বা তাঁহার দেশের বহুস্থান-ব্যাপী অবস্থার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান চিত্র সকল চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া থাকেন। আমাদের এদেশের প্রাচীন ঋষিগণ এইরূপ বিশাল আয়তনের দ্রষ্টা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল এক শতাব্দি বা দুই শতাব্দির নহে,—অথবা এক যুগ বা দুই চারি যুগের নহে, পরন্তু বহু

যুগ, বহু মন্বন্তর এবং বহু কল্পের অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সমূহের অভ্রান্ত দ্রষ্টা হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা মানুষের অসংখ্য ভাবী জন্মের চিত্রাবলী তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে নিরন্তর উন্মুক্ত হইতে দেখিয়া এবং তৎসমস্তের সম্যক্ আলোচনা করিয়া মহাকালের বিশালত্ব তথা মানবমণ্ডলীর পরকালের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সকল যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং পুরাণাদির মধ্যে সে সকল সযত্নে সঙ্কলন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে সকল তত্ত্ব বস্তুতই অমূল্য, অতুল্য এবং ত্রিলোক-বরেণ্য। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আমাদের ধারণাতীত এবং এসময়ে আমাদের পক্ষে অবোধ্য। উহাদের মধ্যে যে সকল কথা অপেক্ষাকৃত কিছু সহজে আমাদের বোধগম্য হইতে পারে, তাহারই আলোচনা এ প্রস্তাবে করা সম্ভবে। কিন্তু একপাত্র গব্যঘৃত শুধুই আহার করিতে উপস্থিত হইলে তাহার সুস্বাদ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করা যায় না, এজন্য যেমন শাক, তরকারি ও অন্নব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা উদরস্থ করিতে হয়, তেমনি কাল সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের অতি উচ্চাঙ্গের উক্তি শুনিতে হইলে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণেরও মুখের দুই চারিটা কথা শুনা একান্ত প্রয়োজন। অতএব কাল সম্বন্ধে দুই একটি পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের অভিমতের আলোচনা অগ্রে করিব।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে সলমান্ একজন প্রবীণ জ্ঞানী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এদেশের শাক্যসিংহকে যেমন "বুদ্ধ" অথবা নিমাইকে যেমন "চৈতন্য" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সেই রূপ সলমান্‌কে তাঁহার সম-সাময়িক পণ্ডিতগণ "কোহেলেৎ" বা পরম জ্ঞানী বলিয়া বিপুল সম্মানের আখ্যা দিয়া রাখিয়াছেন। "কোহেলেৎ", সলমানের নামান্তর ভাবে প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বাইবেলের এবং কোরাণেরও বহুস্থানে ইঁহার উল্লেখ আছে। এই মহাপুরুষের "Ecclesiastes" নামক উপদেশের একস্থানে কাল-সম্বন্ধে এইরূপ একটি অপরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে—"কাল, ঋতু এবং কার্য্যকরণ সুযোগ, এ সমস্তই ঈশ্বর সৃষ্ট সামগ্রী*।" বাইবেল এবং কোরাণেও এই মর্ম্মের উক্তির অপ্রতুল নাই। যে যে সম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরকে সর্ব্বস্রষ্টা ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলা হইয়াছে, তাহাতে কালকে ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু না বলিয়া উপায়ান্তর নাই। এ অবস্থাতে কালকে অনাদি অনন্ত বলিয়াও গ্রহণ করা চলে না। ইউরোপের অধুনিক খৃষ্ট-

---

* "Koheleth seems now to rise for a moment into a religions mood. * * * Times, seasons, and oppertunities, he says, are of divine appointment."

প্রোফেসর আলফ্রেড উইলিয়ম মোমেরী কৃত—
AGNOSTICISM গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মানুরক্ত কোন কোন প্রবীণ লেখক কালকে এখনও "আদি-অন্ত-বিহীন" পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। মিঃ গ্রিউ একজন চিন্তাশীল লেখক, তিনি তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"Time, which consisteth of parts, can be no part of infinite duration or of eternity; for then there would be an infinite time past to-day, which to-morrow would be more than infinite. Time is one thing, and infinite duration is another."

উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য্য এই—

কাল, অংশ সমূহের সমবায় মাত্র। উহা অসীমের বা অনন্তের অংশ বিশেষ বলিয়া কখনই গৃহীত হইতে পারে না। কারণ— তাহা হইলে অন্তের পূর্ব্বেও অনন্তকাল ছিল বলিতে হয় এবং অন্তের পরেও অনন্তকালের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সময় একটা বস্তু, আর অসীমের স্থিতি আর একটা সামগ্রী—এই দুইটা কখনই এক নহে।

ইয়োরোপের পণ্ডিতগণ মধ্যে অনেকেই কালের গুরুতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে তর্ক-সমুদ্রে ডুব দিয়া এইরূপ অথবা ইহা হইতেও অধিক হাস্যজনক সিদ্ধান্ত হাতে করিয়া উঠিয়াছেন! কিন্তু এজন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারা যায় না। কারণ— "শ্যাম ও কুল—দুই রক্ষা করা অসম্ভব" যে একটি বাঙ্গালা প্রবাদ বাক্য আছে, তাহা এক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞ

প্রযুজ্য হইতে পারে ;—'খৃষ্টান্' থাকিতে হইলে—বাইবেলের কথা অভ্রান্ত বলিয়া মান্য করিতেই হইবে, কাজেই কালকে নিত্যবস্তু বলিয়া স্বীকার করা যে সুকঠিন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জার্ম্মণ-দার্শনিকগণ কিছু অধিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন এজন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, "আদৌ কিছু বস্তু নহে" বলিয়া কালকে উড়াইয়া দেওয়াও সুকঠিন এবং কালকে অনন্ত না বলিয়াও উপায়ন্তর নাই দেখিয়া. কাল সম্বন্ধে আর এক প্রকার অপরূপ মীমাংসা করিয়াছেন! ইঁহাদের মধ্যে মিঃ ই, মচ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—কাল, প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সত্য বস্তু না হইলেও উহা এবং আকাশ উভয়ই আমাদের চিত্তের উপরে মুদ্রিত একটা অনুভব বা বোধ বিশেষ মাত্র। জর্ম্মণী ভাষাতে লিখিত শব্দের ঠিক অনুবাদ হইল কি না মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়. তাঁহার গ্রন্থে লিখিত দুইটা শব্দই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

(১) Zeitempfindungen—কাল সম্বন্ধীয় বোধ।

(২) Raumempfindungen—ব্যোম সম্বন্ধীয় বোধ।

কিন্তু ইহাও এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে,—ইদানীন্তন কালের ইয়োরোপের কোন কোন চিন্তাশীল লেখক কালকে উচ্চভাবে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন—লব্ধপ্রতিষ্ঠ লংফেলো, কালসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাহার গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"What is time? The shadow on the dial,—the striking of the clock,—the running of the sand,—day and night,—summer and winter, months, years, centuries. These are but arbitary and outword signs,—the measure of time, not time itself. Time is the life of the soul. If not this,—then tell me what is time?

উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য্যানুবাদ এই—

কাল কি? সূর্য্য ঘড়ীর কাঁটার ছায়া?—অথবা ক্লক ঘটিকা-যন্ত্রের ঘণ্টার আওয়াজ?—অথবা বালু-ঘড়ীর বালু?—কিম্বা দিন, রাত্রি, শীত, গ্রীষ্ম, মাস, বৎসর, শতাব্দি কি? এ সমস্তই তো কালের বাহ্যিকরূপ-জ্ঞাপক কতকগুলি মানব-কল্পিত সংজ্ঞা মাত্র। ঐ সমস্তই তো কালের পরিমাপ পরিজ্ঞাপক মাপ-পাত্র মাত্র, ইহারা তো কেহই কাল নহে। কাল হইতেছে জীবের জীবনের ও প্রাণ। যদি ইহা না হয়, বল তবে কাল কি?

নিদ্রিত যেমন নিদ্রা-ভঙ্গের পরে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া চারিদিকের অবস্থা ক্রমে উপলব্ধি করিতে থাকে, ইয়োরোপের সুকোমল জড়-সুখশয্যাশায়িত বিদ্বন্মণ্ডলীও তেমনি নিদ্রোত্থিতের ন্যায় ধীরে ধীরে কালের দিকে চাহিয়া উহার গুরুত্ব ও বিশালত্ব ইদানীং হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইয়োরোপের দার্শনিক পণ্ডিতগণ অপেক্ষা কবিগণ এ বিষয়ে অধিক জাগ্রতির পরিচয়

দিতেছেন। কবি সেলী, কালকে সম্বোধন করিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—

"Unfathomable sea! Whose waves are years,
Ocean of Time, whose waters of deep woe
Are brackish with salt of human tears!
Thow shoreless flood—which in they ebb and flow,
Claspest the limits of mortality!"

ইহার মর্ম্মানুবাদ এইভাবে করিতে বাধা নাই—

তুমি অতল সাগর! বর্ষ তব বিচিমালা।
ওহে কালসিন্ধু, নর-বক্ষের দুঃখজ্বালা,
সদা ঝরে চক্ষু পথে—লবণাক্ত তব বারি।
কুল তো তোমার নাই, তবু তোমাতে নেহারি
জোয়ার ভাটার ক্রীড়া, জীবমৃত্যু জড়াইয়া
করিতেছ সম্পাদন সপ্রেমে তারে চুম্বিয়া!

ভাবুক কারলাইল গাহিতেছেন—

"Out of Eternity,
This new day is born;
Into eternity,
At night will return."

ইহার অনুবাদ এইভাবে করা যাইতে পারে—

অনন্ত-সমুদ্ভূত আজিকার এইদিন।
রজনী সমাগমে অনন্তে হইবে লীন॥

কারলাইল, তাঁহার গদ্য প্রবন্ধাবলীর মধ্যেও স্থানে স্থানে কালের বিশাল ভাব গাহিতে ত্রুটি করেন নাই। নিম্নের উদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে তাহা সপ্রমাণিত হইবে।

"That great mystery, of Time, were there no other; the illimitable, silent, never-resting thing called Time, rolling rushingon, swift silent, like an all-embracing ocean-tide on which we and all the universe swim like exhalations, like apparitions whih ARE and then ARE NOT. This is for ever very leterally a miracle—a thing to strike us dumb; for we have no word to speak about it."

উদ্ধৃত অংশের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

এ কালের বিশাল রহস্য—কালকেই বলা যাইতে পারে, যাহার চারিদিকে কূল কিনারা নাই যে সদা নির্ব্বাক অথবা সদা বিপুল পরাক্রমে মহাবেগে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গে আছড়াইয়া পড়িতেছে, সাগরের তরঙ্গের সমান আস্ফালন করিয়া চলিয়াছে। যে তরঙ্গের উপরে আমরা এবং এই বিশ্ব-সংসার—এই দেখা যায় এই দেখা যায় না, এই ভাবে পরমানন্দে সাঁতরাইয়া চলিয়াছি ও চলিতেছে! বস্তুত ইহা একটা দৈব-কার্য্যবৎ বিস্ময়কর—যাহাতে আমাদিগকে বাক্য-বিহীন মূকের অবস্থাতে পরিণত করিতেছে। কারণ—কাল সম্বন্ধে কি ভাষা অবলম্বন করিয়া কি বলিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না—এখানে আমাদের বাক্য নিরুদ্ধ।

মহানুভব কারলাইলের এই উক্তি হইতে অনায়াসেই আমরা বুঝিতে পারি, কালের বিশালত্ব হৃদ্বোধ করিতে পারিয়াই তিনি বিস্ময়ে অবিভূত হইয়াছেন এবং নির্ব্বাক হইয়াছেন। মিঃ বোষ্টন্ নামক আর একটি চিন্তাশীল ইংরাজ গ্রন্থকারের লেখনী-নিঃসৃত কথা পড়িলে আমরা নিঃসংশয়ে জানিতে পারি যে—প্রাচ্য জ্ঞানীদের সহিত চিন্তার আদান প্রদানেই হউক অথবা অন্ত যে কারণেই হউক, পাশ্চত্য গ্রন্থ-কারগণের চক্ষুর সম্মুখেও এখন কাল স্বীয় বিরাট মূর্ত্তির একাংশ ধীরে ধীরে খুলিয়া প্রকাশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি লিখিতেছেন—

"None can comprehend eternity but the eternal God. Eternity is an ocean, whereof we shall never see the shore ; it is a deep, where we can find no bottom."

উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির মর্ম্মানুবাদ এই—

অসীম কালকে একমাত্র অসীম ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই ধারণা করিতে সমর্থ নহে। অসীম কাল অকূল সমুদ্র বিশেষ, যাহার কোন দিকে কোনই কূল কিনারা আমরা দেখিতে পাই না। উহা এরূপ একটি সমুদ্র বিশেষ যাহার তলদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছান আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

প্রাচীন মুনি ঋষিগণের মুখেও কালের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা কতকটা এইরূপ উচ্চ কথা সকলই শুনিয়া থাকি।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কাল সম্বন্ধে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"অনাদি-নিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যান এইভাবে করা যাইতে পারে—

যাহার আদি নাই এবং যাহার নিধন নাই বা অন্ত নাই, যিনি রুদ্রস্বরূপ, যিনি সমস্ত জীবের উৎপত্তি-কারক বা প্রকাশক এবং যিনি সমস্ত প্রাণীকে চরমে আপনাতে লয় করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই কাল বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সুশ্রুত-সংহিতার এক স্থানে উক্ত হইয়াছে—"কালো হি নাম ভগবান্ স্বয়ম্ভুরনাদি-নিধনোঽত্র রসব্যাপৎসম্পত্তী জীবিত-মরণে চ মনুষ্যানামায়ত্তে।"

অর্থাৎ—কালই হইতেছে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সেই কালের আদি নাই এবং অন্তও নাই, যাবতীয় পার্থিব বস্তুতে রসের উৎকর্ষ এবং বিকৃতি এবং মনুষ্যগণের জীবন মরণ সেই কালেরই আয়ত্তাধীন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হইতে এবং সুশ্রুত-সংহিতা হইতে উদ্ধৃত, উপরি উক্ত সংস্কৃত বচনে যেমন কালকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্নভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, ইয়োরোপীয় কোন দেশের কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা দার্শনিক গ্রন্থে কালকে আজি পর্য্যন্ত সেরূপ অতি উচ্চদৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করা

হয় নাই। সেরূপ চেষ্টা তো বহু দূরের কথা, কালের নিত্যত্ব বোধক ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত একটা শব্দ পর্য্যন্ত ইয়োরোপের কোন দেশের কোন ভাষার ভিতরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরাজীর Eternity শব্দকে এদেশের অনেকে এখন কালের নিত্যত্ব ভাববোধক শব্দের স্থানে ব্যবহার করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু 'Eternity' এবং 'নিত্য' এক অর্থ বোধক কথা নহে। ইংরাজী চেম্বার্স অভিধানে Eternity শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"The state of time after death"

অর্থাৎ—মৃত্যুর পরের অবস্থা জ্ঞাপক সময়কে ইংরাজীতে Eternity বলা হয়। আমাদের সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষার 'নিত্য' শব্দের সহিত মানুষের জীবন-মরণের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। তথাপি ইংরাজী অভিধানে যেমন Eternity একটা শব্দ আছে, ইয়োরোপের অনেক ভাষার অভিধানে তাহাও নাই। মূল বাইবেল হিব্রু ভাষাতে রচিত। এই হিব্রু ভাষাতে Eternityরও ভাববোধক কোন শব্দই আদৌ নাই। অসীম 'নিত্য' ভাব-বোধক শব্দ দূরের কথা, "যুগ," "মন্বন্তর," "কল্প" প্রভৃতি কালের সীমাবদ্ধ ভাব-পরিজ্ঞাপক কোন বড় দরের শব্দও ইয়োরোপীয় কোন দেশের কোন ভাষার অভিধান গ্রন্থের ভিতরে আজিও প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছুই নাই। ফরাসী-জর্ম্মণ যুদ্ধের সময়ে, আমাদের

প্রতিবেশী একজন শ্রমজীবী মোসলমান, রাস্তাতে দাঁড়াইয়া তাহার সম অবস্থাপন্ন আর একটি মোসলমানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল—"আরে ভাই, শুনেছ কি, আমাদের মুল্লুকের রাজাকে কহিসর নাকি ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। হাজার টাকা নগদ গণিয়া না পাইলে তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না বলিয়াছে।" বক্তার অঙ্ক-জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমা হাজার পর্য্যন্ত। এ অবস্থাতে এরূপ উক্তি তাহার পক্ষে অযোগ্য নহে। যাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে এই পৃথিবী প্রায় ছয় হাজার বর্ষ হইল সৃষ্টি হইয়াছে—বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, সে ধর্ম্ম মান্য করিয়া,—কোটি কোটি বর্ষ হইতে এই পৃথিবী ইহার বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে যে বিদ্যমান রহিয়াছে ইহা মনে কল্পনা করিতে তাঁহাদের হৃৎকম্প হইবারই কথা। এই সকল বিষয়, একটু স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে—এদেশের শাকপত্র-ভোজী মুনি ঋষিগণ অধ্যাত্মজ্ঞানের যে উচ্চস্থানে উঠিয়া কালকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, টেলিস্‌কোপ্ অক্ষিতে সংযোজন করিয়া ইয়োরোপীয়ান জ্ঞানবিজ্ঞান-গর্ব্বিগণ তাহার নিকটেও যাইয়া আজিও পৌছিতে পারেন নাই এবং শীঘ্র যে যাইয়া পৌছিতে পারিবেন, সে সম্ভাবনাও নাই।

আকাশের অসীমতা উপলব্ধি করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তাহা হইলেও যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি, উপরের দিকে চাহিয়া, স্থূল আকাশের কিয়ৎ অংশ সে দেখিতেছে মনে করিতে পারে, আর যাহার চক্ষু মুদ্রিত রহিয়াছে, সে যেমন

তাহাও পারে না, সেইরূপ অনন্ত কালের বিরাট মূর্ত্তি সন্দর্শন সম্বন্ধেও এক্ষেত্রে আমাদের এবং পাশ্চাত্যদেশবাসীদের কতকটা অবস্থা ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। এদেশের অধ্যাত্ম-জ্ঞানী সাধকগণ, উর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিতে অভ্যস্ত থাকায়, কালের বিরাট মূর্ত্তির যতটুকু ধারণা করিতে পারিতেছেন, জড়বিজ্ঞান অনুশীলনে নিবেশিত-চিত্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি নিম্নাভি-মুখিনী থাকায় তাঁহারা তাহা পারিতেছেন না।

অনন্ত মহাকালের একদিকে বিশাল হইতে বিশাল ভাব, অন্যদিকে সূক্ষ্ম হইতে অতিসূক্ষ্ম ভাব, যেরূপ ঋষিগণ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, সেদিকে চিন্তা করিতে বসিলে বস্তুতঃই বিস্ময়ে বিপ্লুত হইতে হয়। তাঁহাদের দৃষ্টি এই দুই দিকেই যে কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া এখানে দেখাইতেছি।

আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সূর্য্যের একবার উদয় হইতে অস্তগমন কার্য্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা "দিবা" গণনা করিয়া থাকি। ঐরূপ সূর্য্যের অস্ত হইতে সূর্য্যের উদয়কালকে আমরা "রাত্রি" বলিয়া ব্যাখ্যা করি। এই দুই মিলিয়া আমাদের অর্থাৎ মানবীয় "অহোরাত্র" হয়। ত্রিশ দিবারাত্রে আমাদের মাস গণনা হয়। আমাদের একমাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্র সংঘটন হয়। শুক্লপক্ষ তাঁহাদের দিবা, কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। বারমাসে:

বা ৩৬৫ দিবারাত্রে আমাদের এক বৎসর হয়। এইরূপ আমাদের এক বৎসরে দেবলোকের এক দিবারাত্র সম্পূর্ণ হয়। উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিবা, দক্ষিণায়ন তাঁহাদের রাত্রি। দেবতাদের দিবারাত্র হইতে ব্রহ্মার দিবারাত্র আরও বৃহৎ। আমাদের চারি হাজার যুগে ব্রহ্মার একটি দিন, আর ঐ পরিমাণ কালব্যাপী তাঁহার একটি রাত্রিকেই প্রলয় নামে অভিহিত করা হয়। এই হিসাবে গণনা করিতে বসিলে আমরা দেখিতে পাই—আমাদের অর্থাৎ মানবীয় ৯৪৬৭৪৯-৮৭০০০০০০০ দিনে ব্রহ্মার একমাস পূর্ণ হয়! আমাদের দিনের হাতকাটিদ্বারা ব্রহ্মার এক বৎসরের পরিমাপ করিতে হইলে ১২ দ্বারা উপরি উক্ত অঙ্ক পূরণ করিতে হইবে। শাস্ত্রে ব্রহ্মার পরমায়ু একশত বৎসর কীর্ত্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ মানবীয় দিনের গণনাতে ব্রহ্মার পরমায়ুর দিন সংখ্যা —১১৩৬০৯৯৮৪৪০০০০০০০০০; কিন্তু এই স্থানেই কালসম্বন্ধে ঋষিগণের দূরদৃষ্টির শেষ সীমা উপস্থিত হয় নাই। শিবপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—

"ব্রহ্মা বিষ্ণোর্দিনে চৈকো বিষ্ণুরুদ্রদিনে তথা।
ঈশ্বরস্য দিনে রুদ্রঃ সদাখ্যস্য তথেশ্বরঃ।
সাক্ষাৎ শিবস্য তৎসংখ্যা তথাহ্বোঽপি সদাশিবঃ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মা বিষ্ণুর একদিনে, বিষ্ণু রুদ্রের একদিনে, রুদ্র ঈশ্বরের একদিনে এবং ঈশ্বর সদাশিবের একদিনে লয় প্রাপ্ত হয়েন, ঐ ঐ পরিমাণ কালই

তাহাদের পরমায়ু। অর্থাৎ ব্রহ্মার একশত বৎসরে বিষ্ণুর একদিন, বিষ্ণুর একশত বৎসরে রুদ্রের একদিন, রুদ্রের একশত বৎসরে ঈশ্বরের একদিন এবং ঈশ্বরের একশত বৎসরে সদাশিবের একদিন গণনা করা হয়। সদাশিবের পরমায়ুর পরিসীমা, শাস্ত্রকারেরাও করিতে পারেন নাই। "নিত্য" এবং "সদা" সম-অর্থ পরিজ্ঞাপক শব্দ। নিত্যশিব বা সদাশিবের আদি অন্ত নাই, জন্ম মৃত্যু নাই, আবির্ভাব বা তিরোভাবও নাই, কাজেই তাঁহার পরমায়ুরও একটা সীমা সংখ্যা নাই। কোন পুরাণে "সদাশিব" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, কোন পুরাণে বা "পরব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, ভাষায় যাহাই ব্যবহার করা হউক না কেন, ফলিতার্থে মহাকালরূপী মহাসাগরের অতল জলে আসিয়াই, কল্প, মন্বন্তর, ব্রহ্মার পরমায়ু, বিষ্ণুর পরমায়ু, রুদ্রের পরমায়ু প্রভৃতি কালের পরিমাপ-বাচক যাবতীয় শব্দ এবং তন্নিহিত বিশাল ভাবগুলি সমস্তই তলাইয়া গিয়াছে। কালের বিরাট মূর্ত্তি-সম্বন্ধীয় মানবীয় ভাষা, ভাব ও অনুভূতির অন্তিম সীমার স্তম্ভ এই "সদাশিব"কেই বলা যাইতে পারে। সাধক ঋষিগণ, একদিন অতিকষ্টে এই সীমাস্তম্ভের পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন,—আমরা ইহার কোটি কোটি যোজন দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত ভাষার কতকগুলি বড় বড় শব্দ মাত্র আজি মুখে আবৃত্তি করিতেছি, দুঃখের বিষয়, ঐ সকল শব্দের অন্তর্নিহিত বিশাল ভাবের এক কণিকাও

হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছি না। সদাশিবের একটিমাত্র দিনের আয়তন চিন্তা করিতে উপস্থিত হইলে আমাদের চক্ষু স্থির হয়। মানবীয় কতদিনে সদাশিবের একদিন হয়, তাহার অঙ্ক পর পর পূরণ করিয়া বাহির করিতে হইলে মহা প্রতিভা-শালী ইয়োরোপীয়ান অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের হৃদয়ও নিদারুণ অবসন্ন হইয়া পড়িবে। মহাকালের বিরাট মূর্ত্তির একদিকের ত' আয়তন এইরূপ, অন্যদিকের অর্থাৎ—তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবের দিকে এখন একবার দেখা যাউক :

অহোরাত্রকে আট ভাগে বিভক্ত করিলে, তাহার এক এক ভাগকে প্রহর বলা হয়, কিন্তু বৎসরে কেবল দুই দিন ভিন্ন তুল্য পরিমাপের প্রহর হয় না। কারণ চার প্রহরে দিন হয় এবং চার প্রহরে রাত্রি হয়। কাজেই রাত্রি এবং দিনের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে প্রহরের পরিমাপের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৎসরে যে দিন দিবারাত্র সমান হয়, সেদিন ৭॥ সাড়ে সাত দণ্ডে প্রহর হয়। এই হিসাবে ৬০ দণ্ডে বা ঘটিকায় এক দিবারাত্র সম্পূর্ণ হয়। জ্যোতিষের কোন কোন গ্রন্থে দণ্ডকে "নাড়ী"ও বলে। এক নাড়ীতে ৪ কাষ্ঠা থাকে ; এক কাষ্ঠায় পনর কলা থাকে, প্রতি কলা ছয় প্রাণে বিভক্ত, আট নিমেষে এক প্রাণ ধরা হয়। এই হিসাবে পূরণ করিয়া চলিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—১৭২৮০০ নিমেষে এক দিবারাত্র পূর্ণ হয়। আট লবে এক নিমেষ অবধারণ করা হইয়াছে। আট ত্রুটিতে এক লব হইয়া থাকে,

অর্থাৎ ১১০৫৯২০০ ক্রুটিতে দিবারাত্র বিভক্ত। এক ক্রুটির ভিতর ৮ অণু রহিয়াছে, অর্থাৎ আমাদের মানবীয় অহোরাত্রকে ৮৮৪৭৩৬০০ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহারই এক এক ভাগকে "অণু" সংজ্ঞা দেওয়া হয়। মহাকালের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূর্ত্তি আমরা হৃদয়ে ধারণা করিতে অসমর্থ। আমাদের সম্মুখস্থ বিলাতী ঘড়ির কাঁটায় এক সেকেণ্ডের নীচে আর কিছুই দেখাইতে পারে না। ৮৬৪০০ সেকেণ্ডে এক দিবারাত্র হয়। এক সেকেণ্ড কত অল্প সময়, তাহা ঘড়ির কাঁটার গতি দেখিয়া সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই এক সেকেণ্ডকে ১০২৪ ভাগে বিভক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের শাস্ত্রোক্ত একটি অণুর দর্শন পাওয়া যাইতে পারে। মহাকালের দুই দিকের এই দুই অচিন্ত্য মুর্ত্তির মধ্যে বিরাট হইতেও বিরাট এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম আর একটি মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহারই নাম "বর্ত্তমান কাল।" বর্ত্তমান কাল লইয়া সকলেই সর্ব্বদা আলোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে, এই "বর্ত্তমান" বস্তুটিকে একাধারে পূর্ব্বকথিত অণু হইতেও ক্ষুদ্রাকারে এবং ব্রহ্মার দিনমান হইতেও বৃহদায়তনে আমরা দেখিতে পাই। বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্যের সহিত বিজড়িত করিয়া যখন আমরা "বর্ত্তমান" কালকে চিন্তা করিতে থাকি, তখন "বর্ত্তমানের" বৃহদায়তন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাসিত হয়। আবার সেই "বর্ত্তমান" বস্তু হইতে

"অতীত" এবং "ভবিষ্যৎ" বিচ্যুত করিয়া যখন উহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি, তখন অণু হইতেও উহা ক্ষুদ্র হইয়া যায়, এমন কি—জ্যামিতির রেখার ন্যায় উহাকে একটি অতীত ও ভবিষ্যৎ বিভাজক চিহ্নমাত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই কথাটা আর একটু পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইতে চাহিলে দুই একটি লৌকিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা-প্রণালীর কথাই ধরা যাউক। মোসলমান-রাজ্য শাসনকালের পরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় হইতে এদেশে প্রজাপুঞ্জের বিদ্যাশিক্ষা দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং এখনও যাহা করিতেছেন এবং অতঃপর আরও কিছুদিন যাহা অনুসৃত হইবে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এই সকলকে একত্রীভূত করিয়া আমরা "বর্ত্তমান শিক্ষানীতি" কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকি। এইভাবে কতকটা অতীত কাল এবং কতকটা ভবিষ্যৎ কাল, টানিয়া লইয়া আমাদের বর্ত্তমান কালের কথাকে আমরা গঠন করিয়া লই। "আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল নহে" যখন বলিয়া থাকি, তখন বুঝিতে হয়—গত দুই এক মাস কিম্বা গত দুইচার দিন ধরিয়া আমি অসুস্থ আছি। অদ্যও আমার শরীর সুস্থ নহে। আগামী কল্য অথবা তৎপরেও আরও দুই, চার, দশ দিন আমার শরীর অসুস্থ থাকিবারই সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইরূপ প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই এবং প্রত্যেক কথাতেই

অতীত এবং ভবিষ্যৎকে জড়াইয়া ধরিয়া বর্ত্তমানের আলোচনা করিতে আমরা অভ্যস্ত। আমার মিত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখন কেমন আছ?" উত্তরে আমি বলিলাম—"এখন ভাল আছি।" এখন—বেলা মনে কর ২টা ৩৫ মিনিট। এই প্রশ্নের "এখন" এবং উত্তরের "এখন"—এ দুইই, এই ২টা ৩৫ মিনিটের কয়েক মিনিট অতীত এবং কয়েক মিনিট ভবিষ্যৎকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তরদান সময়ে, তাহার অব্যবহিত অতীত সময়ের এবং অতি নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যৎ সময়ের শরীরের অবস্থার কথাই চিন্তা করিয়া উত্তর স্থির করিতে হইয়াছিল। কাজেই ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে—আমাদের "বর্ত্তমান" বিষয়ক সর্ব্ববিধ আলোচনা খানিকটা অতীত ও খানিকটা ভবিষ্যৎকে আশ্রয় করিয়াই, করিতে হয়। কারণ যখন দেখিতেছি, অদ্য ঠিক ২টা ৩৫ মিনিটের সময়, অদ্যকার প্রভাত হইতে ঐ কালের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "অতীতে" গ্রাস করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, আর ২টা ৩৫ মিনিটের এক নিমেষমাত্র পরেই অদ্য দিবার অবশিষ্টকাল "ভবিষ্যতের" অধিকারভুক্ত। এ অবস্থাতে "এখন ভাল আছি" বলিতে হইলেই অপর দুইয়ের নিকট হইতে কিছু কিছু চাহিয়া লইয়া, আমার "এখনে"র মূর্ত্তি গঠন করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। যে "বর্ত্তমানের" এইরূপ দশা,

সেই "বর্ত্তমান"কে লইয়া আমরা সকলেই আজি মহাব্যাকুল, আর উহার দুই দিকে স্থিত যে "অতীত" ও "ভবিষ্যতের" দুই বাহুর আশ্রয় অবলম্বন ভিন্ন "বর্ত্তমান" এক নিমেষের জন্যও নিজ পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না, সেই অতীত কাল ও ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ চিন্তা করিবারই আদৌ প্রয়োজন উপলব্ধি করি না। এ দেশের প্রাচীনকালের ঋষিগণের আচরণ কিন্তু অন্যরূপ ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা অতীত এবং ভবিষ্যতের চিন্তাই অধিক পরিমাণে করিতেন। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আয়তন, ভবিষ্যতের অর্থাৎ পরকালের কথার আলোচনাতেই প্রায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে, একদিকে আমাদের জীবনের অনন্ত অতীত, অন্যদিকে অনন্ত ভবিষ্যৎ বা পরকালের মধ্যে, আমাদের ইহকাল অর্থাৎ আমাদের জীবন-ব্যাপী সময়টা নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। সুবিস্তৃত পরকালের জন্য অতি অল্পক্ষণস্থায়ী ইহকালের কয়েকটা দিনের মধ্যে—"কি ভাবে কি কাজ সম্পন্ন করিতে পারিলে, অতঃপর আমরা সুখশান্তি লাভ করিতে পারি," এইরূপ চিন্তাতে এদেশের প্রাচীন পুরুষগণের চিত্ত অভিভূত হইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছুই নাই।

তাঁহারা যে এইরূপ চিন্তার সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া, ধীরে ধীরে, নানা তর্কবিতর্কের বহুল কণ্টকাকীর্ণ এক একটি গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিমালয়-সমতুল্য বিশাল সাত্ত্বিক জ্ঞানের অত্যুচ্চ ধবল শিখরদেশে অধিরোহণ করিয়া, এপারের—ইহলোকের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়াও সুদূর পর-পারের পারলৌকিক তত্ত্ব সকল পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে তাহাই দেখাইবার জন্য সযত্নে শাস্ত্রগ্রন্থ-মধ্যে, অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, ইহাই সমধিক বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহারা কি ভাবে শাস্ত্রগ্রন্থ-মধ্যে এই সকল অমূল্য সামগ্রী আমাদের জন্য স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এখন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ঋষিগণ দেখিলেন—আমাদের পরকালের কথা, আমা-দিগকে জানাইতে হইলে, প্রথমতঃ আমরা যে আছি, এই কথাটিই আমাদিগকে বুঝাইতে হইবে। মানুষ যে জড় নহে, মানুষের দেহকে অবলম্বন করিয়া যে চৈতন্য বিরাজ করে, সেই চৈতন্যময় একটা কিছু সামগ্রী, তাহাকে জীবাত্মাই বলা হউক, বা অন্য যে কোন নামেই তাহাকে অভিহিত করা হউক, সে তাহার এই মানব-দেহ প্রাপ্তির পূর্ব্বেও ছিল এবং এই মানব-দেহের বিনাশের পরেও অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও যে কোন না কোন ভাবে বর্ত্তমান থাকে, ইহাই যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া, ছয় জন ঋষি, ছয়খানি বৃহৎ দর্শন-গ্রন্থ

সংকলন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আজ-কালকার অনেক পাঠকের এইরূপ একটা ভ্রমাত্মক ধারণা রহিয়াছে যে—এই ষড়্‌দর্শন কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য সঙ্কলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আমাদের এই দেহাশ্রিত জীবাত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ এবং কিভাবে তাহার মুক্তি সংঘটিত হইতে পারে, ইহাই হইতেছে—আমাদের ষড়্‌দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। জড় দেহকে আশ্রয় করিয়া জড়ের অতিরিক্ত চৈতন্যময় "আমি" একটা কিছু আছি, সপ্রমাণিত হইলে জড়-জগতের অতিরিক্ত বিরাট্ চৈতন্যময় কোন কিছুর অস্তিত্বও উহার সঙ্গে সঙ্গে সহজে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। দর্শন-শাস্ত্রেও তাহাই করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

কেবল এই দেশেই যে এই ভাবে দার্শনিক বিচার করা হইয়া থাকে, তাহা নহে। চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি সুবিস্তৃত ভূখণ্ডবাসী—যাহাদিগকে ইংরাজী পুস্তকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ঘোষণা করা হয়, এবং সেই সকল পুস্তক পড়িয়া যাহাদিগকে আমরা এখন "নাস্তিক" বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই সকল দেশবাসী প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণও শব্দগত একটু ঘোরফের রক্ষা করিয়া ফলিতার্থে জীবের অস্তিত্ব এবং জীবমাতৃকা পরমাশক্তির অস্তিত্ব মান্য করিয়া থাকেন। এদেশে আমরা যেভাবে "জীবাত্মা" শব্দের অর্থ-বুঝিতে চেষ্টা করি, তাঁহারা তাহা করেন না। আমরা যাহাকে "জীবাত্মা" বলি তাঁহারা

তাহাকে "কর্ম্মগ্রন্থি" বলেন। কালকে আশ্রয় না করিয়া কর্ম্মের উদ্ভব হইতে পারে না। ব্যষ্টিভাবে অসংখ্য কাল-কণিকা আশ্রয় করিয়া, যে সকল কর্ম্মধারা সমুদ্ভূত হইতেছে, তাহাই কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মানব প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। সমষ্টিরূপে মহাকাল সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। এজন্য চীন, জাপান এবং তিব্বতের অধিকাংশ অধিবাসী মহাকালের উপাসক। তিব্বতে সংস্কৃত "মহাকাল" শব্দই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনে এবং জাপানে মহাকাল ভাব-বোধক তত্তদ্‌দেশীয় ভাষার প্রতিশব্দ প্রচলিত হইয়াছে। তাঁহারা শাক্যসিংহকে বিশ্ববরেণ্য মহাকালের অবতার বলিয়াই মান্য করেন এবং পূজা করেন। ব্যষ্টিভাব-বোধক কাল-কণিকা আশ্রিত "কর্ম্মগ্রন্থি" আর সমষ্টি ভাব-বোধক মহাকাল, তাঁহাদের দৃষ্টিতে পৃথক সামগ্রী নহে। এজন্য জ্ঞানী লামাগণ বিপদাপৎ কোন সময়েই তাঁহাদের উপাস্যের নিকট কোনরূপ প্রার্থনা করিতে চাহেন না। এদেশের বেদান্তদর্শনের অত্যুচ্চ ভাব চীন, তিব্বতের জ্ঞানী লামাগণের মধ্যে এই পদ্ধতিতে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের মহাকালেও কতকটা আমাদের এদেশের তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মহাকালের ছায়া প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত "জীব-শিবের" কথার সহিত চীন, তিব্বতের মহাকাল ও কাল-কণিকা-আশ্রিত কর্ম্মগ্রন্থি এবং এদেশের

বেদান্তদর্শন-বর্ণিত মহাসমুদ্র এবং সমুদ্রের বীচিমালার দৃষ্টান্ত এক ঘোর রহস্যময় সম্বন্ধে যে সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থের নানা আখ্যায়িকার বর্ণনার ভিতরে এই রহস্য কি ভাবে, ধীরে ধীরে, উদ্ঘাটিত ও পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যথাসময়ে দেখাইতে চেষ্টা করা যাইবে। এক্ষণে জড়দেহ-আশ্রিত চিন্ময় আত্মার সর্ব্বকাল-ব্যাপক-স্থিতি, উহার স্বকৃত কর্ম্মানুসারে ঊর্দ্ধ বা নিম্নাভিমুখী গতি এবং উহার জন্মান্তর-পরিগ্রহ-রাহিত্য বা মুক্তি-প্রাপ্তির অধিকার সম্বন্ধে এদেশের ও অন্যান্য দেশের পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

আত্মার নিত্যত্ব-সমর্থন, সাধারণতঃ তিনটি পথ অবলম্বন করিয়া, প্রায় সকল দেশেই করা হইয়া থাকে। (১) ধর্ম্ম-গ্রন্থ বা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতার উক্তি। (২) দার্শনিক যুক্তি। (৩) জনসমাজে প্রেতের অনুষ্ঠিত অলৌকিক কার্য্যাদি সন্দর্শন।

পৃথিবীতে নানা দেশের নানা সম্প্রদায়ের মানব-মধ্যে এখন অসংখ্য ধর্ম্ম-মত প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু প্রধানতঃ যে চারিটিকে আশ্রয় করিয়া সভ্য জগতের শিক্ষিত-সমাজে ইদানীং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথার আলোচনা হইয়া থাকে, তাহা এই—

(১) ঋষি-শাসিত ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, যাহাকে সাধারণতঃ "হিন্দুধর্ম্ম" বলা হয়।

(২) লামা-শাসিত ধর্ম্ম, যাহাকে সাধারণতঃ "বৌদ্ধধর্ম্ম" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

(৩) যীষুখৃষ্ট-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, যাহাকে সাধারণতঃ "খৃষ্টধর্ম্ম" বলা হয়।

(৪) মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, যাহাকে সাধারণতঃ "মোসলমান-ধর্ম্ম" নামে ঘোষণা করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয়ের কোন একজন প্রবর্ত্তক বা মাত্র একখানি শাসন-গ্রন্থ নাই। তৃতীয় ও চতুর্থের প্রবর্ত্তকের নামেই ঐ দুই ধর্ম্মমত প্রচলিত এবং ইঁহাদের একের আদেশ-বাক্য যাহাতে লিপিবদ্ধ আছে, সেই ধর্ম্ম-গ্রন্থের নাম—"বাইবেল" ও অন্যের আদেশ-বাক্যসকল যাহাতে সংগৃহীত রহিয়াছে, সেই ধর্ম্ম-গ্রন্থের নাম—"কোরাণ।" ফলিতার্থে—প্রথমকে আশ্রয় করিয়া দ্বিতীয় এবং তৃতীয়কে আশ্রয় করিয়া চতুর্থ ধর্ম্ম-মত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বলিতে বাধা নাই। মানুষের জীবাত্মার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা লইয়া এই চারি সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-উপদেষ্টারা, যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলেই, ইহা অতি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যায়। এই কথাটি আরও একটু ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত-কোষ্ঠ অঙ্কিত করিয়া দিতেছি—

৩

জীবাত্মা-প্রকৃতি সম্বন্ধে—	হিন্দুধর্ম্ম-মতের সিদ্ধান্ত।	বৌদ্ধধর্ম্ম-মতের সিদ্ধান্ত।	খৃষ্টধর্ম্ম-মতের সিদ্ধান্ত।	মোসলমান-ধর্ম্ম-মতের সিদ্ধান্ত।
১। জীবাত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত—	১। জীবত্মা নিত্য।	১। জীবাত্মা (কর্ম্ম-গ্রন্থি) নিত্য।	১। জীবের সৃষ্টি আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ-কালের জন্য জীব কেহ মর, কেহ অমর।	১। জীবের সৃষ্টি আছে কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের জন্য জীব কেহ মর, কেহ অমর।
২। জীবাত্মার জন্মান্তর-পরিগ্রহ এবং নিজকর্ম্মফলে উর্দ্ধ ও নিম্নগতিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত—	২। উহার অতীতে অসংখ্য জন্ম হইয়াছে, ভবিষ্যতেও অসংখ্য জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কর্ম্মানুসারে উহার উর্দ্ধ ও নিম্নগতি প্রাপ্তি হয়।	২। উহার অতীতে অসংখ্য জন্ম হইয়াছে, ভবিষ্যতেও অসংখ্য জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কর্ম্মানুসারে উহার উর্দ্ধ ও নিম্নগতি প্রাপ্তি হয়।	২। জন্মান্তর পরিগ্রহ হয় না। শেষ বিচারের পরে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক প্রাপ্তি হয়।	২। জন্মান্তর পরিগ্রহ হয় না। শেষ বিচারের পরে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক প্রাপ্তি হয়।
৩। জীবাত্মার মুক্তি-প্রাপ্তির অধিকার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত—	৩। নির্ব্বাণ-মুক্তি-লাভের অধিকার আছে।	৩। নির্ব্বাণ-মুক্তি-লাভের অধিকার আছে।	৩। নির্ব্বাণ-মুক্তি নাই।	৩। নির্ব্বাণ-মুক্তি নাই।

জীবাত্মার অধিকার এবং স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ব্বপৃষ্ঠায় লিখিত সার-সিদ্ধান্তগুলি, ব্যাকরণ-সূত্রের ন্যায়, সংক্ষিপ্ত ভাষাতে কোন ধর্ম্মগ্রন্থেরই কোন একস্থানে একত্রীভূত বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই;—গ্রন্থ-বর্ণিত বহুস্থানের বহু উক্তি মন্থন করিয়া এই সারতত্ত্বগুলি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি। কি ভাবে ইহা আমরা জানিতে পারিতেছি, এখন তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ইয়োরোপীয়ান্ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্যে একথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে,—ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীনতত্ত্ব-সঙ্কলন, জগতের আর কোন দেশের কোন ভাষাতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদকে তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্ব-প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।* এই ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৪শ সূক্তে, মানবের মৃতদেহ-বিচ্যুত জীবাত্মাকে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মের কথা সকল কথিত হইয়াছে—

"গমন কর, গমন কর, সেই সনাতন পথ ধরিয়া গমন কর, যে পথে ইতিপূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বা পিতৃগণ গমন করিয়াছেন। সেখানে দেখিতে পাইবে—যম এবং বরুণরাজদ্বয় আমাদের প্রদত্ত আহুতি ইত্যাদি পাইয়া,

* ম্যাক্সমূলর, ORIGIN of RELIGION গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"One thing is certain. there is nothing more ancient and primitive, not only in India,

পরিতুষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। যাও,—স্বর্গলোকে আমাদের পিতৃগণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য যাও; যমের সহিত সম্মিলিত হইতে যাও; তুমি এখানে যে সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য চলিয়া যাও। মন্দকর্ম্মফল বা কর্ম্ম-বাসনা সকল এখানে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাও। যাও, তোমার নিজ সুখের বাসস্থানে যাও। যাও, সেখানে যাইয়া, নূতন কলেবর পরিগ্রহণ কর *।"

ঋগ্বেদের আর এক স্থানে 'মৃতদেহের' সৎকারের সময়ে ঐ দেহ-বিচ্যুত জীবাত্মাকে এবং দেহ-দগ্ধকারী অগ্নিকে সম্বোধন

but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rig-Veda."

* বেদের সংস্কৃত মন্ত্রগুলি সধারণ পাঠকের অবোধ্য, বিশেষতঃ ত্রিশূলপত্রে এই শ্রেণীর মন্ত্রাদি উদ্ধৃত করিবার নিয়ম না থাকায়, পণ্ডিত ভাণ্ডারকার ও ধ্রুব শোধিত মিঃ পিটরসনের কৃত উহার ইংরাজী অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Go forth, go forth, by the old paths, by which our fathers, that were before us, passed: thou too shalt look on the Twin Kings rejoicing in our sacrifice on Yama and on god Varuna. Go meet the fathers in heaven on high, meet Yama, meet the good works which thou hast done: leave here all evil, and go home, there glorious meet another body."

করিয়া কতকগুলি প্রার্থনামূলক মন্ত্র উচ্চারণের পদ্ধতি দেখিয়া, পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়,—ঋষিগণ জীবাত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই—

"তোমার চক্ষুতে যে দৃষ্টিশক্তি ছিল, তাহা সূর্য্যদেবে যাইয়া সম্মিলিত হউক, তোমার নিশ্বাস বায়ু পবনদেবে যাইয়া সংযুক্ত হউক, তোমার দেহের স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল গাছপালাতে যাইয়া আশ্রয় লাভ করুক; যাও, স্বর্গ বা পৃথিবী—যাহা তোমার উপযোগী স্থান হয়, তুমি তাহাতে চলিয়া যাও" ইত্যাদি। তৎপরে অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—"যাহা অজ, যে অংশের জন্ম মৃত্যু নাই, সেই অংশ, হে অগ্নিদেব! তোমার প্রভা দ্বারা উদ্দীপ্ত করিয়া, উহাকে সিদ্ধলোকে বা ঊর্দ্ধ লোকে বহন করিয়া লইয়া যাও †।"

† সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্সমুলর, তাঁহার কৃত ORIGIN of RILIGION গ্রন্থের একস্থানে, এই অংশের এই ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন—"The poet says, first, that the eye should go to the sun, the breath to the air, that the dead should return to heaven and earth, and his limbs rest among herbs. * * * Warm it with thy warmth! May thy glow warm it and thy flame! Assume thy kindest form, O fire, and carry him away to the world of the Blessed!" ইহা লিখিয়া গ্রন্থকার জিজ্ঞাসা

বেদের উপনিষদ্ ভাগে আমরা দেখিতে পাইতেছি,—মৃতপ্রায় দেহের প্রাণবায়ু যখন ঐ দেহ হইতে নির্গত হয়, সেই সময়ে সেই সঙ্গে উহার অধিদেবতা একাদশ রুদ্রও দেহ ত্যাগ করেন। অর্থাৎ আমাদের এই দেহ কেবল জীবাত্মার নিকেতন নহে, উহা দেবতাগণেরও বাসস্থান। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একস্থানে বিদগ্ধ ও যাজ্ঞবল্ক্য মধ্যে এতৎসম্বন্ধে যে কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-মূলে সংস্থিত প্রাণের অধিদেবতা দশ রুদ্র এবং বুদ্ধির অধিদেবতা এক রুদ্র, এই একাদশ রুদ্র যখন মৃতদশা প্রাপ্ত মানুষের দেহ পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হয়েন, তখনই তাহার আত্মীয়-স্বজনগণ উহার মৃত্যু হইল

করিয়াছেন—"Whom? Not surely the goat; not even the corpse, but the unborn the eternal part of man." প্রাচীনকালে মৃতদেহের সহিত একটা ছাগ, চিতাতে আহুতি দিবার বোধ হয় প্রথা ছিল, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার এখানে ছাগের কথা তুলিয়াছেন। গ্রন্থকারের শেষ তিন পংক্তির মর্ম্মানুবাদ এই,—কাহাকে অগ্নিদেব উর্দ্ধলোকে লইয়া যাইবেন? ছাগকে কখনই নহে। মৃত শরীরটাকেও অবশ্য নহে। তবে কাহাকে? শরীরবিচ্যুত মানুষের সেই অংশটি, যাহাকে অজাত বলা হয় (জন্মহীন বলা হয়) এবং যাহা নিত্য।

বলিয়া রোদন করিয়া উঠে। রোদনের কারণ-উদ্ভাবক বলিয়া ইঁহারা "রুদ্র" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন *।

কেবল ইহাই নহে, আমাদের প্রাণের পরিচালক এই রুদ্রগণও আবার এক সর্ব্বব্যাপী মহাপ্রাণ বা মহাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। ঋগ্বেদে ইঁহারই উক্তি এইভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—

রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্য এবং যত দেবদেবীকে আমি চালনা করি। মিত্র ও বরুণকে আমি ধারণ করি। ইন্দ্র ও অগ্নিকে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমি সঞ্জীবিত রাখি। * * * যে কেহ চক্ষুতে যাহা কিছু দর্শন করে, নাসিকায় নিশ্বাস গ্রহণ করে, কর্ণে যাহা কিছু শ্রবণ করে, মুখে আহার্য্য বস্তু যাহা কিছু আহার করে, তাহারা নিজে ইহা

* প্রয়াগ, পাণিনি-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত বৃহদারণ্যক উপনিষদের সুবৃহৎ ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থ হইতে এস্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"There ten devas of Prans in a man and Brihaspati the deva of Budhi as the eleventh, when these presiding devas go out of the body of a dying man then they make the relatives weep. They are called Rudras because they make them weep."

অবগত না থাকিলেও, আমিই তাহাদের ঐ সকল কর্ম্ম-শক্তির পরিচালক এবং সকলকে আমিই পরিচালনা করি। *

ঋগ্বেদে সন্নিবিষ্ট এই মহাবাক্য হইতে ইহাই জানিতে পারা যাইতেছে যে,—আমাদের প্রত্যেকেস্ব দেহস্থিত জীবাত্মা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত বিরাট আকারে সেইরূপ আর একটি কিছু রহিয়াছেন;—ইঁহাকেই কেহ "পরমাত্মা" কেহ বা "পরব্রহ্ম" কেহ বা "পরমা শক্তি" ইত্যাদি নামে, নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে, অভিহিত করিয়া থাকেন। ইঁহার আদি নাই অন্ত নাই, জন্ম নাই মৃত্যু নাই, ইনি নিত্য। আমাদের দেহস্থিত জীবাত্মাও যে এইরূপ জন্ম-মরণ ও আদি-অন্ত বিহীন এবং নিত্য, ইহা কঠোপনিষদের একস্থানে অতি পরিষ্কারভাবে উক্ত

---

* মিষ্টর পিটর পিটরসন্ কৃত Hymns from the Rigveda হইতে নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

"I walk with the Rudras and the Vasus, with the Adityas too, and all the host of gods: I bear up the Two, Mitra and Varuna; I sustain Indra and Agni and the Two Asvins. * * * By me, whoever sees, or breathes, or hears what is said, ets food: They know it not; but are under my control."

হইয়াছে *। কেবল এই কথা বলিয়াই কঠোপনিষৎ নিরস্ত হয়েন নাই, ইহাও বলিতেছেন যে,—এক অগ্নি যেমন ভিন্ন ভিন্ন আধারে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়, তেমনি এক আত্মাই বিবিধ আধারে স্থিতিলাভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন † ।

দীপাগ্নি এবং বিশ্বাগ্নিতে যেরূপ সম্বন্ধ, আমাদের বুঝিবার জন্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মাতেও সেইরূপ একটা কিছু অতি-ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, মনে করিয়া লইতে বাধা নাই। এদেশের প্রাচীন দার্শনিকেরা পুনঃ পুনঃ এই ভাবেরই কথা বলিয়াছেন।

---

* "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
(কঠোপনিষৎ)

ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিয়া অর্জ্জুনকে ইহাই বলিয়াছেন।

† "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"
(কঠোপনিষৎ)

ফলকথা—যেমন সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপ, মানব-বুদ্ধির অগম্য, তেমনি আমাদের দেহব্যাপী আমাদের জীবাত্মার স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করাও আমাদের সাধ্যাতীত। জীবাত্মার স্বরূপ আংশিক উপলব্ধি করাও সুকঠিন। কেবল আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের পক্ষেই যে সুকঠিন তাহাই নহে, পরন্তু অতি পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যখন এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তখন তাঁহারাও অনেক সময়ে এ সম্বন্ধে এইরূপই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কঠোপনিষৎ, বেদেরই অন্তর্ভূত বলিয়া গৃহীত ও পূজিত হয়। ইহাতে ঋষিপুত্র নচিকেতার ও যমরাজের কথোপকথনের প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—যম, নচিকেতাকে তাঁহার নিকট হইতে যে কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু গ্রহণের বর প্রদান করিলে, নচিকেতা বলিলেন "মৃত্যুর পরে জীবাত্মার অবস্থা জানিবার জন্য আমার অতিশয় বাসনা রহিয়াছে, আপনি কৃপা পূর্ব্বক এই জীবতত্ত্ব আমাকে অবগত করান।" উত্তরে যম বলিলেন, "এবিষয়ে পুরাকালে দেবতারাও নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। ইহা অবগত হইতে পারা সহজ ব্যাপার নহে। তুমি আর কোন বর প্রার্থনা কর" *।

---

* ডাক্তার মুর কৃত কঠোপনিষদের অনুবাদ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Death answers—' Even the gods have of old been in doubt on this subject; for it is not

পুনঃ পুনঃ এই ভাবে নিরস্ত করা সত্ত্বেও নচিকেতা যখন কিছুতেই অন্য বর প্রার্থনা করিতে সম্মত হইলেন না, তখন যমরাজ, জীবাত্মা সম্বন্ধীয় অনেক কথা বর্ণন করিয়া অবশেষে বলিলেন—"অন্তের নিকটে শিক্ষা দ্বারা ইহা জানিবার উপায় নাই, চিন্তা দ্বারাও ইহা জানিবার উপায় নাই। তখনই ইহা জানিতে পারা যায়, যখন নিজে ইঁনি আপনাকে জানাইয়া থাকেন" †।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও মুনি জরৎকারের পুত্র আর্ত্তভাগের প্রশ্নোত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য কিয়ৎপরিমাণে এইরূপই রহস্যময় উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মৃতের বাক্‌শক্তি যখন যাইয়া উহার উৎপত্তি-স্থান অগ্নিতে

---

† "This soul is not attainable by teaching, nor by the understanding, nor by much Vedic learning. It is attainable by him whom it chooses." (ডাঃ মুরকৃত কঠোপনিষৎ।)

মিঃ গফ্ নামক আর একটি সংস্কৃতজ্ঞ ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিত উপনিষদের এই অংশের অনুবাদ আর একভাবে করিয়াছেন। তাহাও এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"This spiritual reality is not atainable by learning, by memory, by much spiritual study, but if he choose this reality, it may be reached by him; to him the soul unfold its essence."

সম্মিলিত হয়, প্রাণবায়ু যখন বায়ুতে, দৃষ্টিশক্তি যখন সূর্য্যে, মন যখন চন্দ্রে, শ্রবণশক্তি যখন আকাশে, স্থূলদেহ যখন পৃথিবীতে, দেহস্থিত পরমাত্মার অংশ যখন সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে, দেহের লোমরাজী যখন শাকসব্জীতে, মস্তকের কেশ যখন বনস্পতিতে, দেহের শোণিত ও বীর্য্য যখন জলে যাইয়া মিলাইয়া যায়, তখন এই মানব কোথায় কি অবস্থাতে থাকে?" যাজ্ঞবল্ক্য অতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রশ্নকারীর হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন—"কেবল তুমি এবং আমি এ বিষয়ের আলোচনা করিব। অযোগ্য ব্যক্তি-গণকে ইহা শুনিতে দেওয়া হইবে না।" এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে নির্জ্জন স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলে, আর্ত্তভাগ আবার যখন ঐ প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে এইমাত্র বলিলেন—"কর্ম্ম।" তাঁহারা উভয়ে সমস্বরে বলিলেন—"কর্ম্ম" *। যাজ্ঞবল্ক্যের এই রহস্যময় উত্তর হইতে, (বলিতে লজ্জা কি?) জীবাত্মার স্বরূপ আমরা ত' কিছুই

* প্রয়াগ, পাণিনি-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ হইতে এতৎসম্বন্ধীয় কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"Artabhaga asked thus :—"O, Yajnavalka, when the organ of speech of this dead goes to and becomes one with its source—Agni, his vital air to Vayu, his eye to the sun, his mind

বুঝিতে সমর্থ হইলাম না, মহা মহা পণ্ডিতেও ইহা হইতে অধিক যে কিছু বুঝিতে পারিলেন, তাহাও মনে হয় না। হয়ত' বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহ, বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত এই রহস্যময় উত্তর হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনার বীজ আয়ত্ত করিয়া থাকিবেন ;—কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের বীজমন্ত্রই হইতেছে "কর্ম্ম।"

এই কর্ম্মই "উপাদানকে" আশ্রয় করিয়া, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মে প্রাপ্ত, বিভিন্ন স্থূল দেহের সহিত প্রত্যেক মানুষকে একটা নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে,—ইহাই হইতেছে

to the moon, his ear to the quarters, his body to the earth, the Paramatman (within his body) to the Pramatman spreading outside in the sky, the hairs of his body to the annual herbs, the hairs of his head to the trees, his blood and semen to the waters, where does this man remain then?" "Well, friend," said Yajnavalkya, "Give me your hands and we two only, O Artabhaga, shall know of it; and the unfit persons shall not know it." Going out they two discussed it. What they said was "It is Karma only." What they praised was—"It is Karma only."

বৌদ্ধধর্ম্মের সারতত্ত্ব। * বৌদ্ধধর্ম্ম মতে, এই বন্ধনকে ছিন্ন করিবার একমাত্র অস্ত্র আত্মজ্ঞান। আর সেই আত্মজ্ঞান অস্ত্র আয়ত্ত করিয়া কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পারিলেই "নির্ব্বাণ" প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শাক্যসিংহ জাতিস্মর ছিলেন বলিয়া প্রকাশ এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার বহু অতীত জন্মের বিস্তৃত বিবরণ শিষ্যগণ-সন্নিধানে ব্যাখ্যান করিয়াছেন। পালী ভাষাতে লিখিত "মহাজাতক" পুস্তকে তাঁহার অতীত জন্মের এই সকল বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার কতকাংশের

* সংস্কৃতাদি বহুভাষাভিজ্ঞ প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্যর মনিয়র উইলিয়মস্, তাঁহার BUDDHISM গ্রন্থে এই বিষয়ের বহুল আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"It is this Act-force KARMA, combined with upadan clinging to existence, which is the connecting link between each man's past, present, and future bodies" বৌদ্ধদিগের গ্রন্থের "উপাদান" শব্দের অনুবাদ করিতে যদিও এখানে ইংরাজীতে clinging to existence লিখিত হইয়াছে কিন্তু, এ অনুবাদের উপর নির্ভর না করিয়া উপাদানকে "উপাদান"ই লিখিয়া রাখা হইল। উপাদান অর্থে এখানে জীবাত্মা মনে করিতে বাধা কি ?

ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশ হইয়াছে। এই জাতকগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি,—শাক্যসিংহ তাঁহার বৌদ্ধ অবতারের দেহপ্রাপ্তির পূর্ব্বে চারিবার মহাব্রহ্মার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, বিংশতিবার ইন্দ্রপদ লাভ করিয়াছিলেন, একবার খরগোস পশুর দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিরাশীবার সাধু সন্ন্যাসী, আটান্নবার রাজা এবং চব্বিশবার ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আঠারবার বানর, একবার ব্যাধ, ছয়বার হাতী, এগারবার মৃগ এবং একবার কুকুর জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চারিবার সর্প, ছয়বার কাদাখোঁচা পাখী, একবার ভেক, দুইবার মৎস্য, দুইবার শূকর এবং দশবার যে সিংহযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার বেশ স্মরণ আছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যতবারের অতীত জন্মের যত কথা তাঁহার স্মরণ ছিল, তাহার মধ্যে একবারও নারীদেহে তাঁহার জন্মপরিগ্রহণের কথা তাঁহার স্মরণ হয় না, ইহা তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল উক্তি দ্বারা, ইদানীন্তন কালের বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক যে স্বয়ং জীবের জন্মান্তর পরিগ্রহণ-তত্ত্ব পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করিতেন ইহা অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়। "ইদানীন্তন কালের বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক" শব্দগুলি এই কারণে এখানে লিখিতে হইতেছে,—শাক্যসিংহ স্বয়ং ইহা বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে এই কল্পে আরও চারিজন বুদ্ধদেব জগতে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরে, পাঁচহাজার বৎসর অতীত হইলে, মৈত্রেয় বুদ্ধ নামে আর এক বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইবেন।* ইনি এখন "তুষিত" নামক স্বর্গলোকে রহিয়াছেন। অতি প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থে স্বর্গের, নরকের এবং স্বর্গলোকবাসী দেবদেবীগণের বর্ণনা প্রচুর-পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের স্বর্গের সংখ্যা সাত। কিন্তু কোন কোন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে ছাব্বিশটি স্বর্গ-লোকের বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায় †। বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থে

* স্যর মনিয়র উইলিয়মস্, তাঁহার কৃত BUDDHISM গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"Gautama is the forth Buddha of the present age (Bhadra-Kalpa.) He was a Kashatriya; his three mythical predecessors—Kraku-cchanda, Kanaka-muni, and Kasyapa—having been sons of Brahmans. He is to be followed by fifth Buddha, Maitreya, but not untill the doctrine of Gautama has passed out of men's memory after five thousand years."

† স্যর মনিয়র উইলিয়মস্ তাঁহার কৃত গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"And here it will be necessary to give an acconnt of the later Buddhist theory of twenty-six successive tiers of heavens, one rising above the other."

ভীষণ নরকেরও বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাও কথিত হইয়াছে,—মানুষ, নিজকৃত সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উর্দ্ধে বা স্বর্গলোকে এবং অসৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অধোলোকে বা নরকে যাইয়া উপনীত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থে আটটি নরকের ভয়ঙ্কর চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। তলাতল, রসাতল ইত্যাদি নামেও কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে নরকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্র-বর্ণিত ভূলোকের নামই বোধ হয়, বৌদ্ধ লামাগণ "কাম-লোক" রাখিয়াছেন। কারণ, কামলোকের উর্দ্ধে স্বর্গলোক ও কামলোকের অধোদেশে নরকের স্থান তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থানুসারে, এই সকল স্বর্গের সুখ ও নরকের দুঃখ, নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে, ছয়টি বিভিন্ন প্রকারের দেহ-ধারণ দ্বারা বা ছয়টি পৃথক্ অবস্থাপ্রাপ্তি দ্বারা উপভোগ করিতে হয়,—বৌদ্ধধর্ম্মের ভাষায় ইহাকে "গতি" বলা হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে, আমাদের সুখ-দুঃখ ভোগের ভোগ-দেহ বা আমাদের "গতি" এই ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ;—

(১) দেব-দেহ।
(২) মানবদেহ।
(৩) অসুর বা রাক্ষস-দেহ।
(৪) পশুদেহ।
(৫) প্রেত-দেহ।
(৬) নারকীয় দেহ—নরকভোগের দেহ।

আমাদের এই ভূলোক বা মর্ত্তলোক বা বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থের ভাষাতে "কামলোক" যেমন অসংখ্য মানবের আবাসভূমি, তেমনি স্বর্গলোক অসংখ্য দেবদেবীর বাসস্থান। এদেশের অনেক পাঠকের নিকট এসকল কথা সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা পালী ভাষাতে লিখিত প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়াছেন কিম্বা উহার জর্ম্মণ বা ইংরাজী ভাষার অনুবাদ সযত্নে অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন,—বেদ ও পুরাণ-বর্ণিত হিন্দুর প্রায় সমস্ত দেব-দেবীর অস্তিত্বই চীনের এবং তিব্বতের বৌদ্ধলামাগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতে সম্ভ্রমের সহিত স্বীকার করিয়া আসিতেছেন *।

বৌদ্ধগণ, যে কারণেই হউক, আত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও তাঁহাদের গ্রন্থে ব্যবহার করিতে চাহেন না, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ-বর্ণিত কর্ম্ম-গ্রন্থি বা কর্ম্মধারা যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকেই "জীবাত্মা" বলিয়া আমরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি। যদি তাহাই করা হয়, তাহা হইলে সেই জীবাত্মার বা "কর্ম্মগ্রন্থির" নিত্যত্ব সম্বন্ধে এবং উহার অতীত কালে যে অসংখ্য জন্ম-পরিগ্রহণ

---

* স্যর মনিয়র উইলিয়মস্ তাঁহার কৃত BUDDHISM গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"As to the gods, bear in mind that Buddhism recognized most of the deities of Hinduism."

হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎকালেও যে অসংখ্য জন্ম-পরিগ্রহণের সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহার নিজ-কৃত কর্ম্মানুসারে যে উহার ঊর্দ্ধ ও নিম্নগতি প্রাপ্তি হয়, অন্ততঃ এ সকল বিষয়ে সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতঃ কিছুমাত্র মতভেদ যে নাই, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। "নির্ব্বাণ" শব্দটি মুক্তিকে লক্ষ্যস্থলে স্থাপন করিয়া, যদিও উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু নির্ব্বাণের অর্থ ঋষিগণ যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, বৌদ্ধ দার্শনিকগণ তাহা করেন নাই। এইস্থানেই আমাদের ধর্ম্মমতের সহিত বৌদ্ধমতের একটা বিষম অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম-মতানুসারে "নির্ব্বাণ" অর্থ,— 'অনুপাধি-শেষ,' অর্থাৎ নিজের এককালীন বিনাশ সাধন *। পালী ভাষাতে "নির্ব্বাণ" শব্দের রেফবর্জ্জন করিয়া "নিব্বাণ" লিখিত হয়। আর্য্য-ধর্ম্মমতে নির্ব্বাণ-মুক্তির অর্থ—জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সমাধান। বৌদ্ধগণ নিজের অস্তিত্ব নাশ করাকেই তাঁহাদের ধর্ম্মমার্গের শেষ সীমা বলিয়া অবধারণ

* মিঃ চিলডার্স সঙ্কলিত পালীভাষার অভিধানে "নির্ব্বাণ" শব্দের অর্থে লিখিত হইয়াছে—

"Anupadhi-sesha, that is, Nibbana without remains or remnants of the elements of existence."

করিয়াছেন *। হিন্দুগণ, অজ-অমর জীবাত্মার অস্তিত্ব কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না জানিয়া, উহার আত্যন্তিক দুঃখ-নাশকেই মুক্তি বলিয়াছেন এবং আমাদের চিত্তের সর্ব্ববিধ বাসনা নির্ব্বাণ করিয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মার অভিন্ন ভাব উপলব্ধিকেই সেই "আত্যন্তিক দুঃখনাশের" একমাত্র উপায় নিরূপণ করিয়াছেন। নির্ব্বাণ বা মুক্তি-প্রাপ্তির একটি প্রধান পথ, আমরা যেমন বাসনাবর্জ্জনকে বলিয়া থাকি, বৌদ্ধগণও তেমনি বাসনাবর্জ্জনকেই তাঁহাদের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এখানেও উভয় সম্প্রদায়ের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধগণ, দশটি বন্ধন দ্বারা জগতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া থাকেন এবং তাহারই মোচন দ্বারা, তাঁহারা কর্ম্মবন্ধন-বিমুক্ত হইয়া

---

* স্যর মনিয়র উইলিয়মস্, তাঁহার BUDDHISM গ্রন্থে "নির্ব্বাণ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন—"It may be summed up in a few words as a scheme for the establishing of a paradox—for the perfecting of one's self by accumulating merit with the ultimate view of annihilating all consciousness of self—a system which teaches the greatest respects for the life of others, with the ultimate view of extinguishing one's own."

নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন, সিদ্ধান্ত করেন *। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থানুসারে পূর্ব্বকথিত দশটি বন্ধন এই—

(১) নিজের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ভ্রমাত্মক বোধ।

(২) সন্দেহ,—উপদেষ্টার উপদেশবাক্যে এবং তাঁহাদের কথিত ধর্ম্মমার্গের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ।

(৩) যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে মঙ্গল হয় এরূপ ভ্রম-বিশ্বাস পোষণ।

(৪) দৈহিক সুখ-সম্ভোগ পিপাসা।

(৫) অসৎ ইচ্ছা।

(৬) বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা,—এই স্থূল বা জড়জগতে।

(৭) বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা;—সূক্ষ্ম জগতে (অর্থাৎ স্বর্গাদিতে) যাইয়া।

(৮) অহঙ্কার।

(৯) আত্মপ্রতিষ্ঠা। (আমি ধার্ম্মিক, আমি সৎমার্গে চলিয়াছি, ইত্যাদি জ্ঞান।)

(১০) অজ্ঞান।

উপরি লিখিত দশটি 'বন্ধন-কারণ' মধ্যে কতগুলির সহিত আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত, জীবের-বন্ধন-কারণের যে সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা শাস্ত্রানুশীলনকারী হিন্দুমাত্রেই

* মিঃ এডমণ্ড হোলমস্ কৃত THE CREED of BUDDHA দ্রষ্টব্য।

দেখিতে পাইবেন, তবে, দুই একটি বিষয়ের যৌক্তিক দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া কাহারও কাহারও ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্য-রেখা একটু প্রসারিত হওয়াও অসম্ভব নহে; কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহাদের ইহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে,—বুদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার এই সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নাই; পরন্তু নিরক্ষর বা অর্দ্ধশিক্ষিত জগতের জন-সাধারণকে নিজ প্রচারিত ধর্ম্ম-মতে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে, তাহাদেরই গ্রহণোপযোগী উপদেশ বাক্য সকল তিনি গ্রাম্যভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল উক্তির কোনটির সারবত্তা, কোনটির বা অসারত্ব সম্বন্ধে যিনি যাহাই বিবেচনা করুন না কেন, এই সকল উক্তি হইতে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারক যে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মমতকে অনুসরণ করিয়া জীবের নিত্যত্ব ও উহার ঊর্দ্ধ-নিম্নগতি স্থির করিয়াছেন এবং মুক্তিমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন, ইহা অনায়াসেই আমরা স্থির করিতে পারি। খৃষ্টিয়ান এবং মোসলমানগণের, জীবের নিত্যত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবের। খৃষ্টিয়ানেরা মানব-দেহস্থিত জীবাত্মাকে (Soulকে) ঈশ্বরের (Godএর) সৃষ্ট বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন। অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন নিজ-ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ প্রথমতঃ মানুষের দেহ প্রস্তুত করিয়া তৎপরে মানুষের soulকেও তিনি নির্ম্মাণ করিয়া ফুৎকার দ্বারা

উহা দেহেতে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। প্রথমতঃ এই "soul" (সোল) শব্দ লইয়াই অতিশয় গোল। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার "জীবাত্মার" অনুবাদ করিতে উপস্থিত হইয়া ইদানীং সকলকেই soul শব্দ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। Soul যদি জীবাত্মা শব্দের প্রতিশব্দ হয়, তবে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—spirit অর্থ কি? অনেকে বলেন, soul এবং spirit একই অর্থবোধক শব্দ। ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহার কারণ এই যে, খৃষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাইবেলের মধ্যে কোন কোন স্থানে soul এবং spiritকে বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে আমরা দেখিতে পাই। বাইবেলের একস্থানে, সেণ্টপলের উক্তিমধ্যে লিখিত হইয়াছে—

'And may your spirit and soul and body be preserved entire without blame at the comming of our Lord Jesus Christ."

এখানে body (দেহ) soul (জীব) এবং spirit (আত্মা) তিনটী পৃথক বস্তুর উল্লেখ আমরা দেখিতে পাইতেছি। বাইবেলের বহু স্থানে ঈশ্বরকে Holy spirit বা spirit বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি ঈশ্বর Holy soul বলিয়া কথিত হয়েন নাই। পুরাণ-বর্ণিত ত্রিমূর্ত্তির ন্যায় বাইবেলেও সৃষ্টিকর্ত্তা God, পালনকর্ত্তা তস্য পুত্র Jesus Christ,—(যীশুখৃষ্ট) এবং সম্ভবতঃ সংহারকর্ত্তা Holy ghost বা Holy spirit (পবিত্রাত্মা),

এই তিন মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু Godএও স্পিরিট রহিয়াছে এবং তাঁহার স্পিরিট সময়ে সময়ে জগতে অবতীর্ণ হইবারও বর্ণনা বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যাইতেছে, বাইবেল বর্ণিত Soul এবং Spirit এক বস্তু নহে। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনানুসারে মানবদেহ-মধ্যে Soul (সোল) এবং Spirit (স্পিরিট) দুইই অবস্থান করেন জানিতে পারিয়া, আমাদের বুঝিবার গোল আরও বৃদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। মূল বাইবেল হিব্রু ভাষাতে লিখিত হইয়াছে; উহার ইংরাজী বা বাঙ্গালা অনুবাদ-গ্রন্থই আমাদের একমাত্র সম্বল। সংস্কৃত বেদের ইংরাজী অনুবাদ যেমন অনেক স্থলে ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ, মূল হিব্রু বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদও সেইরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। বাইবেলের লিখিত Soul এবং Spirit শব্দের অর্থ উপলব্ধি করা ব্যাপার লইয়া, এ অবস্থাতে আমাদের ন্যায় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন দেশবাসীর এরূপ গোলে পতিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে,—যেহেতু ইংলণ্ডের বহু ভাষাবিৎ কোন কোন প্রবীন পণ্ডিতকেও যখন বাইবেলোক্ত এই দুইটা শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে যাইয়া বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িতে আমরা দেখিতেছি *।

---

* খৃষ্টধর্ম্ম সমর্থক ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ডেবিড সন তাঁহার THEOLOGY of the OLD TESTAMENT গ্রন্থের এক স্থানে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

এই দুইটি শব্দের প্রকৃত অর্থের উপরে খৃষ্টধর্ম্ম দুই পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই দুইটি শব্দের অর্থ লইয়া বিষম গোলযোগ চলিয়াছে। এই গোলযোগকে, স্বয়ং যীশুখৃষ্ট, তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাহার শিষ্যগণ সম্মুখে এক প্রকার আকাশ বাণী দ্বারা আরও প্রগাঢ় করিয়া তুলিয়াছেন। বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি, তাঁহার মৃত্যু পরে, একসময়ে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন।

"Handle Me and see, for a Spirit hath not flesh and bones as ye and Me have."

"According to Davidsan" any distinction of a substantial or elemental kind between (হিব্রু অক্ষরে spirit অর্থবোধক শব্দ) and (হিব্রু অক্ষরে soul অর্থবোধক শব্দ) is to be understood. Neither is the spirit higher than the soul or more allied to God. * * * The spirit of man and the Soul of man are not different things but the some thing under different aspect." বাইবেলোক্ত আত্মার ও জীবের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইলে, দুঃখের বিষয়, বাইবেলের অনেকস্থানের উক্তি একেবারে অর্থ শূন্য হইয়া পড়ে!

এই উক্তির মর্ম্মানুবাদ এই ভাবে করা যাইতে পারে,—তোমরা আমাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখ, স্পিরিটের মাংস নাই এবং অস্থি নাই, যাহা তোমরা আমাতে দেখিতেছ।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের এই উক্তি দ্বারা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারি যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুসারে, মানবদেহের মৃতাবস্থা উপস্থিত হইলেই তাহার সমস্ত শেষ হয় না। মৃত্যু হইলেও দেহের অতিরিক্ত আরও কোন একটা সামগ্রী রহিয়া যায়, যাহা পরেও তাহার নিজ ইচ্ছা অনুসারে মনোভাব্ প্রকাশ করিতে পারে এবং মানবীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারে। বাইবেলের বর্ণনানুসারে কিন্তু এই স্পিরিটেরও মৃত্যু হইতে পারে,—পাপের দ্বারা এই স্পিরিটের ধ্বংশ বা মৃত্যু সংঘটন হয়। কিন্তু এইরূপ মৃত স্পিরিট সকল, যীশুখৃষ্ট যে ধর্ম্ম-স্পিরিট দিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে, পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারে। বাইবেল এই পর্য্যন্ত ঘোষণা করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, যীশুখৃষ্টের কৃপাতে গোরস্থিত মৃতব্যক্তি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া কবর বা গোর হইতে যে উঠিয়া আসিতে পারে, ইহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহুস্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন *। স্বয়ং যীশুখৃষ্ট স্বর্গ হইতে

* খৃষ্টসমাজের অনুমোদিত বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদ গ্রন্থ হইতে এই বিষয়ের বর্ণনামূলক কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

অবতরণ করিয়া তাঁহার কোন প্রিয়-শিষ্যকে যে দর্শন দিয়াছিলেন এবং জীবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আশাজনক বাক্য বলিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনাও বাইবেলে রহিয়াছে * ।

"যীশু আসিয়া জানিতে পাইলেন, লাসার চারি দিন কবরে আছেন। বৈথনিয়', যীরুষালমের সন্নিকট, অনুমান এক ক্রোশ দূরে, আর মার্থা ও মরিয়মকে ভ্রাতার বিষয় সান্ত্বনা করিতে ইহুদীদের অনেকে তাঁহাদের নিকটে আসিয়াছিল। যীশু আসিতেছেন শুনিবামাত্র মার্থা গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। * * * সেই কবর একটা গহ্বর এবং তাহার মুখে একখানা প্রস্তর ছিল। যীশু বলিলেন, তোমরা প্রস্তরখানা সরাইয়া ফেল। মৃতব্যক্তির ভগিনী মার্থা তাঁহাকে কহিলেন,—প্রভো, এখন উহাতে দুর্গন্ধ হইয়াছে, কেন না আজ চারি দিন হইয়াছে। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে? তখন তাহারা প্রস্তরখানা সরাইয়া ফেলিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, লাসার বাহিরে আইস। তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন। তাহার চরণ ও হস্ত কবর-বস্ত্রে বাঁধা ছিল। যীশু কহিলেন—ইহাকে খুলিয়া দাও ও যাইতে দাও।"

* বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদ গ্রন্থ হইতে তাঁহার কোন প্রিয় শিষ্যের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"তাঁহাকে দেখিবামাত্র মৃতবৎ হইয়া তাঁহার চরণে পড়িলাম। কিন্তু তিনি আমার গাত্রে দক্ষিণ হস্ত দিয়া

স্বর্গের উল্লেখ বাইবেলের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় *।

কহিলেন, ভয় করিও না, আমি প্রথম ও শেষ ও জীবন্ত; আর আমি মরিয়াছিলাম, কিন্তু দেখ, যুগে যুগে জীবিত আছি; আর মৃত্যুর ও পাতালের চাবি আমার হস্তে। অতএব তুমি যাহা যাহা দেখিলে এবং যাহা যাহা আছে ও ইহার পরে যাহা যাহা হইবে, সে সমস্ত লিখ; আমার দক্ষিণ হস্তে যে সপ্ত-তারা দেখিলে, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সপ্ত সুবর্ণ দীপ বৃক্ষের কথা লিখ; সেই সপ্ত তারা সপ্ত-মণ্ডলীর দূত এবং সেই সপ্ত-দীপ বৃক্ষ সপ্ত-মণ্ডলী।"

এই উক্তিরই নিকটে আর একস্থানে লিখিত হইয়াছে—

"হাঁ আমেন! আমি আলফা ও ওমিগা (আদি এবং অন্ত) ইহা প্রভু ঈশ্বর কহিতেছেন, যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ, যিনি সর্ব্বশক্তিমান।"

* "পরে যীশু অবগাহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিলেন; আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'ইনি আমার পুত্র, ইঁহাতেই আমি প্রীত'।"

(বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত বাইবেল।)

উহারই কিঞ্চিত পরে, আর একস্থানে উক্ত হইয়াছে—

"আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবি সকল দিব;—"

বাইবেলে "বিচার দিনের" বর্ণনা একটি প্রধান বিষয়। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে একদিন বিশ্বসংসারের এই বিচার সম্পন্ন হইবে। এই বিচারে যে সকল জীবাত্মার নাম স্বর্গীয় গ্রন্থে দেখিতে না পাওয়া যাইবে, তাঁহারা অনন্ত নরকে বা অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইবেন, এরূপ কথিত হইয়াছে *।

* ঐ অনুবাদ গ্রন্থ হইতে বিচারসম্বন্ধীয় কথার আরও কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"পরে আমি এক বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন ও তদুপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পলায়ন করিল; তাঁহাদের নিমিত্ত আর স্থান পাওয়া গেল না। আর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান্ যাবতীয় মৃত লোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; পরে কয়েকখানি পুস্তক খোলা গেল, এবং জীবনপুস্তক নামে অন্য একখানি পুস্তক খোলা গেল, এবং মৃতেরা পুস্তকসমূহে লিখিত প্রমাণে আপন আপন ক্রিয়ানুসারে বিচারিত হইল। আর সমুদ্র আপনার মধ্যবর্ত্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল এবং মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্যবর্ত্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইল। পরে মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাই অর্থাৎ সেই অগ্নিহ্রদ দ্বিতীয় মৃত্যু। আর জীবনপুস্তকে যে কাহারও নাম লিখিত পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।"

যীশুখৃষ্ট যাঁহাদের পক্ষে দণ্ডায়মান হইবেন, এই মহাবিচারের দিনে, শত সহস্র পাপে পাপী হইলেও তাঁহাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হইবে, তাঁহারা অমরত্ব লাভ করিবেন * এবং তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইয়া রক্ষা করা হইবে। এই বর্ণনা হইতে জীবাত্মার এক প্রকারের নিত্যত্বই যে কেবল প্রমাণিত হইতেছে তাহা নহে, পরন্তু খৃষ্টীয়ানগণকে, স্বর্গ নরকের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইতেছে। "অনন্ত নরক-ভোগ" কথাদ্বারা ঐ নরকের ভোগকর্ত্তা, যীশুখৃষ্টে অবিশ্বাসী পাপী জীবেরও যে পরমায়ু, অফুরন্ত ক্লেশভোগের জন্য অনন্ত-কাল পরিব্যাপ্ত হইয়া রহে, ইহাও বুঝা যাইতেছে †।

* বাইবেলে, যীশুখৃষ্ট, কতকটা গীতার উক্তি—
"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" ভাবের কথাতে বলিয়াছেন,—"সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যদি কেহ আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখিতে পাইবে না।"

† ঐ বাঙ্গালা বাইবেল হইতে অন্তকাল পাপ-দণ্ড ভোগ সম্বন্ধীয় উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, মনুষ্য-সন্তানেরা যে সমস্ত পাপকার্য্য ও ঈশ্বর নিন্দা করে, সেই সকলের ক্ষমা হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, অনন্ত-কালেও তাহার ক্ষমা নাই, সে বরং অনন্ত পাপের দায়ী।

বৌদ্ধদের জাতকাদি নানা ধর্ম্মগ্রন্থ যেমন বেদ, উপনিষৎ, তন্ত্র, পুরাণকে অনুসরণ করিয়াছেন, মোসলমান-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ, তেমনি খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলকে অনুসরণ করিয়াছেন, বলিতে বাধা নাই। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মগ্রন্থে জীবাত্মা সম্বন্ধে যেমন কথা আছে, মোসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ

উহাকে অশুচি আত্মা আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের এই কথা প্রযুক্ত।"

মৃতের পুনর্জ্জীবন লাভ সম্বন্ধে উক্তি—

"সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনিয়া আমার প্রেরণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু মৃত্যু হইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সত্য, সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এমন সময় আসিতেছে, বরং এখন উপস্থিত যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে এবং যাহারা শুনিবে, তাহারা জীবিত হইবে।"

আর এক স্থান হইতে নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সু-সমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার পরাক্রমের প্রতাপ হইতে সেই দিন অনন্তকাল স্থায়ী বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করিবে,—"

কোরাণেও প্রায় সেইরূপ কথা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য, জীবাত্মা সম্বন্ধীয় মোসলমান-ধর্ম্মমত, পৃথক্ ভাবে আলোচনা না করিলেও ক্ষতি ছিল না; তথাপি পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে কোরাণ হইতে দুই চারিটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। বাইবেলে যেমন জীবাত্মা বিষয়ক "সোল" এবং "স্পিরিট" দুইটা পৃথক্ ভাববোধক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, কোরাণে তেমন দেখা যায় না। কোরাণ আরবী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ। কোরাণের জীবাত্মা বিষয়ক "রু" এবং "নকস্" শব্দ এক অর্থ বাচক বলিয়া আমার অধ্যাপক মৌলবী জহুর হোসেন আমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কোরাণের সুরঃ বা অধ্যায় ধারা সংখ্যা ১৭ বচন ৮৭ তে আমরা দেখিতে পাই,—"তাঁহারা রু (জীবাত্মা) সম্বন্ধে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিবে, রু (জীবাত্মা) আমার প্রভুর আদেশ বহন করে, উহার নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি অপ্রকাশ রাখিয়াছেন।" সুরঃ অধ্যায় ৩ বচন সংখ্যা ২৪শে লিখিত হইয়াছে,—"প্রত্যেক নকস্ (জীবাত্মা) নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাই তাহাকে দেওয়া হয়।" এই দুই উক্তি দ্বারা "রু" এবং "নকস্" এক বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। "রু" এবং "নকস্" এক হউক বা দুই পৃথক্ বস্তু হউক, কোরাণের উক্তি অনুসারে মানুষের মৃত্যু সময়ে স্বর্গীয় দূত আসিয়া "নকস্" নামক জীবাত্মাকে দেহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়।

বৌদ্ধদের জাতকাদি নানা ধর্ম্মগ্রন্থ যেমন বেদ, উপনিষৎ, তন্ত্র, পুরাণকে অনুসরণ করিয়াছেন, মোসলমান-দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ, তেমনি খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলকে অনুসরণ করিয়াছেন, বলিতে বাধা নাই। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মগ্রন্থে জীবাত্মা সম্বন্ধে যেমন কথা আছে, মোসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ

উহাকে অশুচি আত্মা আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের এই কথা প্রযুক্ত।"

মৃতের পুনর্জ্জীবন লাভ সম্বন্ধে উক্তি—

"সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনিয়া আমার প্রেরণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু মৃত্যু হইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সত্য, সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এমন সময় আসিতেছে, বরং এখন উপস্থিত যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে এবং যাহারা শুনিবে, তাহারা জীবিত হইবে।"

আর এক স্থান হইতে নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সু-সমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার পরাক্রমের প্রতাপ হইতে সেই দিন অনন্তকাল স্থায়ী বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করিবে,—"

কোরাণেও প্রায় সেইরূপ কথা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য, জীবাত্মা সম্বন্ধীয় মোসলমান-ধর্ম্মমত, পৃথক্ ভাবে আলোচনা না করিলেও ক্ষতি ছিল না; তথাপি পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থে কোরাণ হইতে দুই চারিটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। বাইবেলে যেমন জীবাত্মা বিষয়ক "সোল" এবং "স্পিরিট" দুইটা পৃথক্ ভাববোধক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, কোরাণে তেমন দেখা যায় না। কোরাণ আরবী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ। কোরাণের জীবাত্মা বিষয়ক "রু" এবং "নকস্" শব্দ এক অর্থ বাচক বলিয়া আমার অধ্যাপক মৌলবী জহুর হোসেন আমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কোরাণের সুরঃ বা অধ্যায় ধারা সংখ্যা ১৭ বচন ৮৭ তে আমরা দেখিতে পাই,—"তাঁহারা রু (জীবাত্মা) সম্বন্ধে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিবে, রু (জীবাত্মা) আমার প্রভুর আদেশ বহন করে, উহার নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি অপ্রকাশ রাখিয়াছেন।" সুরঃ অধ্যায় ৩ বচন সংখ্যা ২৪শে লিখিত হইয়াছে,—"প্রত্যেক নকস্ (জীবাত্মা) নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাই তাহাকে দেওয়া হয়।" এই দুই উক্তি দ্বারা "রু" এবং "নকস্" এক বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। "রু" এবং "নকস্" এক হউক বা দুই পৃথক্ বস্তু হউক, কোরাণের উক্তি অনুসারে মানুষের মৃত্যু সময়ে স্বর্গীয় দূত আসিয়া "নকস্" নামক জীবাত্মাকে দেহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়।

মানুষের মৃত্যুকালে ধার্ম্মিকগণের জীবাত্মাকে মোলায়েম ভাবে অতি যত্নপূর্ব্বক বাহির করিয়া লওয়া হয়, আর পাপিগণের জীবাত্মাকে টানিয়া ছেঁচড়াইয়া নির্দ্দয়ভাবে দেহ হইতে নিষ্কাশন করা হয়। কোরাণ অনুসারে ধার্ম্মিকগণের জীবাত্মা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা মহাপুরুষ, ভবিষ্যৎ বক্তা এবং কোরাণ বিশ্বাসী, মৃত্যু হইবা-মাত্রই তাঁহাদিগকে একবারে স্বর্গে লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য জীবন ত্যাগ করেন, তাঁহা-দিগকে স্বর্গের সবুজ পক্ষীদের হাওলাত করা হয় এবং শেষ-বিচার দিন পর্য্যন্ত সেই অবস্থাতে থাকিয়া তাঁহারা স্বর্গের উৎকৃষ্ট ফল ও পানীয়, আহার ও পান করেন। তৃতীয় শ্রেণীর কোরাণ-বিশ্বাসী জীবাত্মাগণকে, কবরের নিকট বাস করিতে দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে কোরাণের ভাষ্যকার-গণের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, সাতদিন মাত্র কবরের নিকট বাস করিতে দিয়া তৎপরে তাঁহাদিগকে নিম্নস্তরের স্বর্গে লইয়া যাইয়া রক্ষা করা হয় এবং শেষ-বিচার দিনে তথা হইতে আনিয়া বিচারস্থানে উপস্থিত করা হয়। বিচার-অন্তে তাঁহাদিগকে উচ্চ স্বর্গে উন্নীত করা হয়। অবিশ্বাসী পাপীদের জীবাত্মাকে মৃত্যু হইবামাত্রই নরকস্থ করা হয়। শেষ-বিচার দিনে ঈশ্বরের সিংহাসন-সম্মুখে তাহাদিগকে আনিয়া উপস্থিত করিয়া বিচারান্তে আবার কঠোর জলন্ত নরকে তাহাদিগকে নিক্ষেপ

করা হয়।. কোরাণের বৃহদাকারের অনেক ভাষ্যগ্রন্থ আছে; তন্মধ্যে সারু-এল-মওয়াকিফ্ একখানি অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,—"মৃত্যুর পরে মানুষের জীবাত্মার দুইটি গতি প্রাপ্তি হয়। যাঁহারা ঈশ্বর-জ্ঞান পাইয়াছেন, তাঁহারা নিজকৃত ভ্রম-ভ্রান্তি-জনিত কর্ম্মফল ভোগের জন্য যদিও কিছু কিছু মানসিক কষ্টভোগ করিতে থাকিবেন, কিন্তু তাঁহারা একবার যে আলো দেখিয়াছেন, তাহাতেই আলো-অভিমুখী পথে চলিতে থাকিয়া তাঁহারা পরম আনন্দময় স্থানে যাইয়া অবশেষে পৌছিবেন। যাঁহারা অজ্ঞানী, তাঁহারা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দ স্থানে অর্থাৎ অধিক অজ্ঞানের মধ্যে এবং গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যাইয়া ডুবিয়া পড়িবেন" শেষ-বিচারের উক্তিকে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল করে বলিয়া, অনেক ধার্ম্মিক মোসলমান, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাহেন না।

স্বর্গের কথা, বাইবেল অপেক্ষা কোরাণে অধিক বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোরাণের বর্ণনানুসারে, স্বর্গের সাতটি স্তরঃ বা ভাগ আছে। কোরাণে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে,—ঈশ্বর নিজের সুখ-ভোগের জন্য ইহার একটি স্বর্গও সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু জীবের জন্যই এ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে *। মহম্মদ, "মিরাজ" অর্থাৎ নৈশ যাত্রা বিবরণে সাতটি স্বর্গ অতিক্রম করিয়া স্বয়ং ঈশ্বর-সমীপে যাইয়া

* কোরাণের সুরঃ ২১ বচন ১৬ দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত হইয়াছিলেন, এমন কথাও বলিয়াছেন। মহম্মদ আরও বলিয়াছেন,—এক স্বর্গ হইতে অন্য স্বর্গের দূরত্ব পাঁচশত বর্ষের পথ। কোরাণের আর এক স্থানে কথিত হইয়াছে—যাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী এবং ধার্ম্মিক, তাঁহাদিগকে তিনি এমন আনন্দময় স্থানে লইয়া যাইবেন, যেখানে নির্ম্মল সুশীতল জলের নদী, দুগ্ধের নদী, মধুর নদী এবং অতি মনোরম সুরার নদী সদা প্রবাহিত রহিয়াছে। পাপীদের জন্য নরকে উত্তপ্ত জলের নদী রক্ষিত হইয়াছে, যাহা পান করিতে পিপাসিতদের কণ্ঠনালি ও উদর জ্বলিয়া যাইতে থাকিবে। স্বর্গের ন্যায় নরকের বর্ণনাও বাইবেল হইতে কোরাণেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গের ন্যায় নরকও কোরাণ অনুসারে সাত স্তরে বিভক্ত *। কোরাণের ভাষ্যকারগণ এই সাত নরকের নাম ও বিবরণ এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—

১। জাহান্নম নামক নরক। প্রত্যেক মোসলমানকেই এই নরক অতিক্রম করিতে হয় †।

২। লাজা নামক নরক। যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং যাহারা রাশীকৃত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাদের জন্য এই নরক নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

---

* কোরাণের সুরঃ ১৫ বচন ৪৪ দ্রষ্টব্য।

† কোরাণের সুরঃ ১৯ বচন ৭২ দ্রষ্টব্য।

৩। আল্-হুতামা নামক নরক। শাপগ্রস্তদের জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

৪। সাতির নামক নরক। যাহারা পিতৃ-মাতৃ-হীন বালক-বালিকাদের সম্পত্তি ও অর্থ আত্মসাৎ করে, সেই সকল পাপীদের জন্য ইহা প্রতিষ্ঠিত।

৫। সকুর নামক নরক।

৬। আল-জাহিম নামক নরক।

৭। হাবিয়া নামক নরক।

কোরাণের কোন কোন ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—

পাপী মোসলমানদের জন্য জাহান্নম, খৃষ্টিয়ানদের জন্য লাজা, যুদের জন্য আল-হুতামার অগ্নিময় নরক, সাবিয়ানদের জন্য সাতির, মাগীদের জন্য সকুর, প্রতিমাপূজকদের জন্য আল-জাহিম, ভেল-চালক ভেকধারী প্রতারকদিগের জন্য হাবিয়া নামক অতল নরক বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে।

মূল কোরাণে কিন্তু উপরি লিখিতমত শ্রেণী-বিভাগ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় মানুষকে নরকে পাঠাইবার কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই। সাত শ্রেণীর লোকের জন্য এই সাতটি নরক রক্ষিত হইয়াছে, এইমাত্র কোরাণের উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

নরক সম্বন্ধে কোরাণের একটা উক্তি লইয়া মোসলমান-দের মধ্যে বিপুল মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। জাহান্নম

নামক নরকে মোসলমান মাত্রকেই একবার যাইতে হইবে এমন ভয়ঙ্কর কথা কোরাণে কেন লিখিত হইল, ইহা লইয়া আজিও নানা সম্প্রদায় মোসলমানদের মধ্যে নানারূপ তর্ক বিতর্ক চলিয়া থাকে। কোরাণের ভাষ্যকার আল-কমালান্ এসম্বন্ধে এইরূপ সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছেন—

কোরাণে যখন এমন উক্তি রহিয়াছে, তাহা কখনই অনর্থক হইতে পারে না। কোন মানুষই একেবারে যখন পাপশূন্য হইতে পারে না, তখন নিরপেক্ষ-বিচারক ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে, সকল মানুষকেই একবার নরক দর্শন করিতেই হইবে। যাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধার্ম্মিক, তাঁহারা যখন মুহূর্ত্তের জন্য নরক দর্শন করিবেন, সেই সময়ে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রভাবে নরকের কষ্টকর ভাবও কিছুক্ষণের জন্য নিস্তেজ ও নির্ব্বাণপ্রায় থাকিবে। তাঁহারা নরক অতিক্রম করিবামাত্র উহার কষ্টকর ভাব আবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে।

কোরাণের অস্পষ্ট উক্তির এরূপ সদর্থ-উদ্ভাবক ভাষ্যকার আল্-কমালান, এ দেশের মহাভারত-বর্ণিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন আখ্যায়িকার রহস্য হৃদ্বোধ করিয়াই হউক, অথবা যে ভাবেই হউক, এখানে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের উদারতাই প্রকাশ পাইয়াছে। কোরাণের অনেক ভাষ্যকারই তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থের অনেক স্থানে এইরূপ সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মূল কোরাণেও স্বর্গ ও নরক এবং মৃত-জীবের দেহ-বিচ্যুত

আত্মার গতি সম্বন্ধীয় কথাসকল বাইবেলের বর্ণিত ঐসকল বিষয়ের উক্তি হইতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, দেখা যায়। বুদ্ধদেবের পরে যীশুখৃষ্ট এবং যীশুখৃষ্টের পরে মহম্মদ জগতে অবতীর্ণ হওয়াতে, মহম্মদ, তাঁহার পূর্ব্বাগত দুই মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত অনেক কথা জানিয়া তাঁহাদের উপদেশ বাক্য সকল কোরাণে গ্রথিত করিবার যে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কোরাণের বাক্য-রচনা পদ্ধতিও কতকটা এদেশের উপনিষদাদি গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছে। বাইবেল, পুরাণাদির ন্যায় আখ্যায়িকা কথাতে পরিপূর্ণ এবং নানা সদুপদেশে সুশোভিত। গীতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তির সহিত বাইবেলের খৃষ্টের উক্তির অনেক স্থানে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কোরাণ, উপনিষদের আদর্শে সংক্ষিপ্ত বাক্যে এবং পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের স্তুতিবাদে এতই রসাল হইয়া রহিয়াছে যে, উহা মরুভূমিময় আরবদেশের ভাষাতে রচিত না থাকিলে, উহাকে ভারতের মৃত্তিকাজাত সামগ্রী বলিয়া অনেকেই হয়ত' সিদ্ধান্ত করিতেন।

জীবাত্মা, মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয় না, পরেও যে উহার অস্তিত্ব থাকে, নিজকৃত কর্ম্মফলে যে উহার উর্দ্ধগতি ও নিম্নগতি হয়, অন্ততঃ আমাদের শাস্ত্রা-নুমোদিত এসকল কথা যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদ উভয়েই,—ভিন্ন ভাষাতে হইলেও প্রায় একভাবেই, স্বীকার করিতে বাধ্য

হইয়াছেন। শেষ-মহাবিচারের দিনে মানব-দেহ-বিচ্যুত জীবাত্মার নিজকৃত কর্ম্মফলানুসারে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক-ভোগের ব্যবস্থা আমাদের কোন শাস্ত্রগ্রন্থে কিম্বা বৌদ্ধগ্রন্থে না থাকিলেও যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদ উভয়েই এক-বাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে মহম্মদ, যীশুখৃষ্টের উক্তিরই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। যীশুখৃষ্ট তাঁহার অজ্ঞাত-বনবাস সময়ে ভারত-ভূখণ্ডাভিমুখে আসিয়াছিলেন এবং দীর্ঘদিন ভারতখণ্ডে কিম্বা তিব্বতে কিম্বা ভারতের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে যে বাস করিয়াছিলেন, একথা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী প্রায় নির্ব্বিরোধেই এখন স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সময়ে যীশুখৃষ্ট এদেশবাসী কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিম্বা সাধু সন্ন্যাসীর নিকট শ্রুত, ভগবদ্গীতার কোন শ্লোকের অর্থ-ব্যাখ্যান হইতে জীবাত্মার মুক্তি বা অনন্ত স্বর্গের কোনরূপ একটু আভাস পাইয়াছিলেন, এরূপ মনে করিতে বাধা কি? ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত এইরূপ একটি বাক্য আছে—

"যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥"

শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—কর্ম্মফলবাসনা ত্যাগ করিয়া আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে যে পুরুষ যুক্ত, তিনি আত্যন্তিক-শান্তি অর্থাৎ অনন্ত-কালব্যাপী বা পূর্ণশান্তি লাভ

করেন। যাঁহারা আমাতে অযুক্ত, তাঁহারা কামের বশীভূত থাকিবার ফলে বন্ধন-দশাগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

যীশুখৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণদেবের মুখ-নিঃসৃত এই মহাবাক্যের ভাব, তাঁহার কোন গুরুর নিকট হইতে পাইয়া কয়েক বৎসর পরে যীরুষালামে প্রত্যাগত হইয়া নিজের ভাষায় নিজের শিষ্যবৃন্দ মধ্যে যদি এরূপ ঘোষণা করিয়া থাকেন যে—"আমাতে যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করিবে, সে অনন্ত সুখ বা অনন্ত স্বর্গের অধিকারী হইবে আর যাহারা আমাতে বিমুখ থাকিবে, তাহারা অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে." তাহা-হইলে উহা যে কেবল যীশুখৃষ্টের মনগড়া কথা নহে, যীশুখৃষ্টের ঐ উক্তির মূল যে আমাদেরই ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, ইহা মনে করা যাইতে পারে তবে মহাপ্রলয়ের দিনের বিচার-ব্যবস্থার কথা, যীশুখৃষ্টের মনে কোন্ সূত্র ধরিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছিল, কেহ প্রশ্ন করিলে, তাহার সদুত্তর এখন আমরা কিছুই দিতে পারিতেছি না। আমাদের পুরাণ-বর্ণিত মহাপ্রলয়-তত্ত্বের গূঢ় রহস্য, শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করিয়া যিনি উদ্ঘাটন করিতে পারিবেন, তিনি সম্ভবতঃ এ প্রশ্নেরও একটি সদুত্তর দিতেও সমর্থ হইবেন।

জীবাত্মার নিত্যত্ব, উহার নিজকৃত কর্ম্মফলে ঊর্দ্ধ ও নিম্নগতি প্রাপ্তির, তথা জন্মান্তরাদি পরিগ্রহণের অধিকার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত জগতের প্রধান চারি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া যে সকল কথার আলোচনা করা হইল,

তদতিরিক্ত অন্য কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত হইতে কোন নূতন কথা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পাঠককে জানাইবার মত আর কিছুই নাই ; তথাপি পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর দুই চারি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতেও জীবাত্মা সম্বন্ধীয় দুই এক কথার আলোচনা সংক্ষেপে এখানে করিতেছি।

ভারতের দক্ষিণে বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে পার্শী নামক এক সম্প্রদায় বাস করেন। প্রায় বারশত বৎসর অতীত হইল, ইঁহারা পারশ্যদেশ হইতে আসিয়া ভারতের এই অংশে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ "জেন্দ-আভেস্থা",—মৃত্যুর পরেও জীবের যে অস্তিত্ব থাকে এ কথা স্বীকার করেন এবং জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে স্বর্গ নরক প্রাপ্তির কারণ উদ্ভব হয় ইহাও স্বীকার করেন। বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার—কিম্বা অপব্যবহার, ইঁহাদের এই ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দ-অভেস্থার "গাঁথাতে" দেখিতে পাওয়া যায়। "অপব্যবহার" শব্দটি এখানে এইজন্য লিখিতে হইতেছে যে, অমরা "দেব" শব্দ অতি পবিত্র জ্ঞান করি, ইঁহারা তৎপরিবর্ত্তে "দিব" বা "দেব" শব্দটিকে অপবিত্র আত্মা বা কদর্য্য আত্মা কিম্বা সয়তান অর্থে ব্যবহার করেন। "অহুর",—সম্ভবতঃ সংস্কৃত "অসুর" শব্দের অপভ্রংশ,—ইঁহাদের অতি পূজ্য এবং পবিত্রাত্মা প্রতিবোধক স্থানেই ঐ শব্দ, ইঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরমজ্ঞানী "অহুর মাজদা", ইঁহাদের বিশ্বস্রষ্টা

"আশার" পার্শ্বস্থিত প্রধান মন্ত্রী স্বরূপ প্রপূজিত হয়েন। সে যাহাই হউক, ইঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থানুসারে দেহ-বিচ্যুত জীবাত্মাকে, খৃষ্টিয়ান বা মোসলমানদের ন্যায় মহাপ্রলয়-কালীন শেষবিচার-দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না, পরন্তু ধার্ম্মিকগণের জীবাত্মা মৃত্যুর পরেই সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে "অরমজদ" নামক পবিত্রাত্মার সমীপস্থ হইয়া সুখ এবং শান্তিলাভ করিতে পারেন। বিশ্বস্রষ্টা আশা স্বয়ং এই স্থানে অবস্থান করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এখানে যাইয়া জীবাত্মা "আশায়ন" বা আশা-ভাবান্বিত হইতে পারেন এবং এইরূপ হওয়াকেই জীবের সর্ব্বোচ্চ উন্নতি বা পরম গতি বলিয়া এই ধর্ম্মগ্রন্থে কীর্ত্তন করা হইয়াছে।* আমাদের শাস্ত্রোক্ত জীবাত্মার মুক্তি বা নির্ব্বাণ-পদ-প্রাপ্তির কথার সহিত জেন্দ-আভেস্থার এই উক্তির একটু ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি।

বর্ত্তমানে ভারতের আর এক প্রান্তদেশে—পাঞ্জাবে, এক সম্প্রদায় লোক বাস করেন; ইঁহাদের ধর্ম্মকে শিখধর্ম্ম বলা হয়। কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাব প্রদেশে গুরু নানক নামক একটি মহাপুরুষ এই

---

* জেন্দ-অভেস্থার এই উক্তিতে ভগবদ্গীতার "বহবো জ্ঞান-তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতা" ইত্যাদি শ্লোকের ভাব সুন্দর প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যায়।

নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। হিন্দুদের পুরাণাদি ধর্ম্ম-গ্রন্থের উপদিষ্ট কতকগুলি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এবং কিছু গ্রহণ করিয়া, ইহা সংগঠন করা হইয়াছে। জীবাত্মার নিত্যত্ব, বাসনাতে আকৃষ্ট হইয়া উহার পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহণ এবং নিজকৃত সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মের ফল দ্বারা জীবাত্মার ঊর্দ্ধ ও নিম্নগতি প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়গুলি সমস্তই সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া দেবদেবীর প্রতিমা পূজা, অবতার-বাদ, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ইত্যাদি কতগুলি বিষয় বর্জ্জন করিয়া, গুরু নানক এই নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এমন কি হিন্দুর কোন মন্দিরে কখন প্রবেশ করা না হয়, বলিয়া শিষ্যগণের প্রতি তাঁহার উপদেশ রহিয়াছে। কাজেই ইহাকে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত বলিয়া গ্রহণ করা না যাইতে পারিলেও, হিন্দুধর্ম্মের একাংশের মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া যে ইহার ভিত্তিভূমি গঠিত হইয়াছে এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। নানক এই সম্প্রদায়ের পরিচালনের জন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ রাখিয়া যাইতে না পারিলেও তাঁহার প্রদত্ত কতকগুলি উপদেশ-বাক্য "জপজী" নামে সঙ্কলিত হইয়া শিষ্যগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুজী, "গুরুমুখী" অক্ষর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জপজী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার অনেক দিন পরে, এই সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু "জপজী"কে বিস্তার করিয়া "আদি গ্রন্থ" নামে এক বৃহৎ ধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এখন

শিখ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মস্থান—অমৃতসহরের বিখ্যাত স্বর্ণ-মন্দিরের বেদীর উপরে "গ্রন্থসাহেব" নামে ইহাই রক্ষিত হইয়াছে এবং প্রত্যহ ইহা ধূপ, দীপ, পুষ্প, পত্রে পূজিত হইতেছে। এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা যে পূজা-পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন, এখন তাঁহারই গ্রন্থ, তাঁহারই শিষ্য-সেবক-গণের দ্বারা নির্ম্মিত বৃহৎ মন্দিরে প্রতিমা-স্থানীয় হইয়া কেবল প্রত্যহ ধূপ, দীপ, পুষ্প, পত্র, নৈবেদ্যে পূজিত হইতেছে না, দেব-প্রতিমার ন্যায় ইহার ভোগ, আরতি, চামর-ব্যজন এবং রাত্রে খট্টাঙ্গে শয়ানদান ও প্রত্যূষে গাত্রোত্থান উৎসব সম্পাদিত হইতেছে! গুরু নানকের শিষ্যগণ, পরজন্মে সৎগতি লাভ করিবেন, বিশ্বাসেই অতিশয় ভক্তিভাবে এবম্বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

বেদ-পুরাণ অমান্য করিয়া, আবার তাহারই কথার অনুসরণ করিয়া, শিখ সম্প্রদায় যেমন এক ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেইরূপ এদেশের জৈন-সম্প্রদায়েরও আর একটি ধর্ম্মমত আছে। শিখ-গুরু নানকের ধর্ম্মমত হইতে জৈন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত অনেক প্রাচীন এবং ইঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের সংখ্যা অনেক অধিক। সংস্কৃত ভাষাতেও ইঁহাদের অনেক গ্রন্থ আছে; দুঃখের বিষয়, অমুদ্রিত অবস্থাতে ঐ সকল গ্রন্থ থাকাতে এবং প্রাচীন জৈন-ধর্ম্মমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষেরা অদ্যাপি অতি সংগোপনে ও সযত্নে তাহা রক্ষা করাতে, ঐ সকল গ্রন্থ-নিহিত তত্ত্ব, সাধারণের জানিতে পারিবার

সুবিধা নাই। তথাপি মিঃ জেকবি কৃত Metaphysics and Ethics of the Jainas এবং অহম্মদাবাদ হইতে প্রকাশিত গুজরাটী ভাষার জৈন-ধর্ম্মপ্রবেশ এবং ঐ ভাষাতে লিখিত জৈনধর্ম্ম-নিরূপণ, এই তিন খানি গ্রন্থ প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া জৈনধর্ম্মের জীবাত্মা-সম্বন্ধীয় গুটিকতক কথা সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করিতেছি। কোন জৈন-সাধুর নিকট হইতে "সময়সার" এবং "সর্ব্বার্থসিদ্ধি" নামক জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দুইখানি প্রাকৃত ও সংস্কৃত গ্রন্থের কিয়দংশ পাইয়া, তাহা হইতেও কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। জৈনধর্ম্মমতে জীব দ্রব্য, এই দৃষ্টিতে নিত্য এবং জীবের নিজকৃত কর্ম্মফলে পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর গ্রহণ হইয়া থাকে এবং উহার স্বর্গ ও নরকপ্রাপ্তিও হইতে পারে। কর্ম্মসূত্র ছেদন দ্বারা জীবের মুক্তি লাভ হয়। অনেকের একটি ভুল ধারণা আছে যে—বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈনধর্ম্ম অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বৌদ্ধেরা "আত্মার" অস্তিত্ব না মানিয়া তৎস্থলে "কর্ম্মধারা" "কর্ম্মগ্রন্থি" প্রভৃতি কতরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, জৈনগণ সেরূপ গোলযোগ-পূর্ণ সিদ্ধান্ত না করিয়া সোজাসুজি জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যদিও সোজা কথাতে জীবাত্মার অস্তিত্ব ইঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু জড়-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান মন্থন করিয়া জৈনধর্ম্মের জীবতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে জৈন পণ্ডিতগণ দার্শনিক রসে

উহাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করাতে জৈনধর্ম্মের "জীবাত্মা," হিন্দু দার্শনিকদের বোধ্য "জীবাত্মার" সহিত মূলে একসূত্রে নিবদ্ধ থাকিয়াও বাহিরে একটু ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। জৈনধর্ম্মমতে জীবাত্মা স্বয়ং সর্ব্ববিধ সুখ-দুঃখ-ভোগী, উহা চৈতন্য ও বোধময় এবং যখন যে দেহমধ্যে বাস করে, তখন সেই দেহায়তন অনুরূপ উহারও আয়তন প্রাপ্তি হয়। বিভিন্ন আধারে স্থিত জীবাত্মার আকার, অধিকার ও প্রকৃতি বিভিন্ন বলিয়া ইঁহারা সিদ্ধান্ত করেন। জৈনধর্ম্মমতে কেবল ভিন্ন ভিন্ন মানুষে বা পশু-পক্ষীতে, কীট-পতঙ্গে এবং বৃক্ষলতাদিতেই যে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা থাকে তাহা নহে, ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়-পর্ব্বতে, নদ-নদী হ্রদে এমন কি ক্ষুদ্র কূপেও প্রত্যেকের পৃথক জীবাত্মা রহিয়াছে। চন্দ্রের জীবাত্মা, সূর্য্যের জীবাত্মা, নক্ষত্রের জীবাত্মা, মেঘের জীবাত্মা, বাতাসের জীবাত্মা, ঝড়ের জীবাত্মা, পৃথক্ ভাবান্বিত বলিয়া ইঁহারা সিদ্ধান্ত করেন। জীবাত্মার অবস্থা নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া "নবতত্ত্ব" নামে তাহাকে ইঁহারা অভিহিত করেন। জৈনধর্ম্মমতে জীব-সকল পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—একেন্দ্রিয় জীব, দ্বীন্দ্রিয় জীব, ত্রীন্দ্রিয় জীব, চতুরিন্দ্রিয় জীব এবং পঞ্চেন্দ্রিয় জীব। একেন্দ্রিয় জীব আবার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—(১) পৃথ্বীকায়, (২) অপ্‌কায়, (৩) তেজঃকায়, (৪) বায়ুকায়, (৫) বনস্পতিকায়। একটা প্রস্তরখণ্ড,

একরাশি মৃত্তিকা, হীরকখণ্ড, লৌহখণ্ড, স্বর্ণখণ্ড প্রভৃতি বস্তু সকল পৃথ্বীকায় একেন্দ্রিয় জীবশ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে যে জীবাত্মা বাস করেন, তাঁহার পরমায়ুর পরিমাণ ন্যূনকল্পে আটচল্লিশ অন্তরমুহূর্ত্ত এবং ঊর্দ্ধকল্পে বাইশ হাজার বৎসর। অপ্‌কায় শ্রেণীতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন জীবাত্মা নিজ কর্ম্মফলে ন্যূনকল্পে এক নিমেষ, কোন জীবাত্মা উচ্চকল্পে সাত হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত পরমায়ু পাইতে পারেন। বায়ুকায়-অন্তর্ভূত জীবাত্মাদের পরমায়ু এইরূপ এক নিমেষ হইতে তিন হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। বনস্পতিকায়ের অন্তর্নিহিত জীবাত্মা এক নিমেষ হইতে দশ হাজার বৎসরব্যাপী পরমায়ু লাভ করিতে পারেন। জাগতীয় জীবাত্মার এইরূপ পরমায়ুর পরিমাণ সিদ্ধান্ত করিয়া নারকীয় জীবের কষ্টভোগের পরমায়ু কাল, ইহাদের "সর্ব্বার্থসিদ্ধি" নামক অতি প্রাচীন গ্রন্থে দশ হাজার বর্ষ হইতে তেত্রিশ সাগরপম নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। "সাগরপম" শব্দে কতকাল বুঝায়, তাহা কোনও অভিধানের সাহায্যে আমি স্থির করিতে সমর্থ হইলাম না এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু জৈন-সাধুও বলিতে পারিলেন না। নরকের বর্ণনা যাহা জৈনধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও অর্থ উদ্ধার করা অনেক স্থলে অতিশয় কঠিন। জৈনধর্ম্মগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—নরকে রুদ্র বাস করেন, তিনি শূল দ্বারা পাপী নরগণকে পুনঃ পুনঃ

বিদ্ধ করেন। তথায় কাল, প্রাণীদের মাংস দগ্ধ করা কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া রহিয়াছেন। বালু, প্রাণীদিগকে ধরিয়া উত্তপ্ত বালির মধ্যে ভাজিয়া কষ্ট প্রদান করেন। মহাঘোষ, পাপিগণকে নরকের অন্ধকার কূপে বদ্ধ করিয়া রাখেন। নরকের সমসূত্র স্থানে পাতাল অবস্থিত। এই পাতাল এবং নরক এক নহে। "সর্ব্বার্থসিদ্ধি"-বর্ণিত এই পাতালে পাপিগণ প্রবেশ করিতে পারে না;—এখানে অসুর-কুমার, নাগ-কুমার, সুবর্ণ-কুমার, বিদ্যুৎকুমার ও অগ্নি-কুমারেরা বাস করেন। এতদ্‌ভিন্ন পাতালে পিশাচ, ভূত, যক্ষ প্রভৃতিও বাস করেন। জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থে একটা মানব-দেহের চিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বর্গ ও নরকের অবস্থা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এই দেহ-চিত্রের পাদদ্বয়ে "অধোলোক" সংস্থিত। ইহাতে বালুপ্রভা, পঙ্কপ্রভা, ধূমপ্রভা, তমপ্রভা, তমাতম-প্রভা, প্রভৃতি সাতটা নরক আছে। মূর্ত্তির মধ্যদেশে আমাদের এই পৃথিবী স্থাপিত রহিয়াছে। ইহার উপরে স্বর্গ বা উর্দ্ধলোকের স্থান। মূর্ত্তির বক্ষস্থলে বা হৃদয়ে দেব-লোক এবং শিরে মোক্ষলোক প্রতিষ্ঠিত। জৈনধর্ম্মানুসারে চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে ও নক্ষত্রলোকেও দেব-দেবীরা বাস করেন এবং উহাও স্বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল দেব-দেবীরও শ্রেণীবিভাগ আছে, যথা—(১) জ্যোতিষী, (২) বিমানবাসী। বিমানবাসী দেবদেবীর মধ্যেও আবার তিনটি শ্রেণী আছে। ঈশান, মহেন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা

প্রথম শ্রেণী বিমানবাসী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিজয়, বিজয়ন্ত, জয়ন্ত, অপরাজিত, সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ প্রভৃতি দেবতাদের নামেরও উল্লেখ জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনধর্ম্মানুসারে দেবলোকের উপরে অর্দ্ধচন্দ্রাকার সিদ্ধশিলা সংস্থিত—এখানেই সিদ্ধেরা বাস করেন।

বৌদ্ধদের "নির্ব্বাণের" ন্যায় জৈনদের "মুক্তিপ্রাপ্তি" অর্থ জীবাত্মার বিনাশ নহে,—জীবাত্মার ক্লেশভোগের অবসান হইয়া অনন্তকালের জন্য শান্তি-সুখভোগের অবস্থাকেই তাহারা মুক্তি বা সিদ্ধিপ্রাপ্তি বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থানুসারে জীবাত্মা এই অবস্থাতে উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়। সর্ব্বত্র দর্শন-ক্ষমতা জন্মে, অসীম শক্তি, অবিনশ্বরতা, দেহভিন্ন অবস্থিতির অধিকার এবং পূর্ণ শান্তিলাভ হয়। কেবল এই অংশে নহে, জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থের আরও অনেক কথার সহিত আমাদের সাংখ্য-দর্শনের অনেক সিদ্ধান্তের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জীবতত্ত্বের দার্শনিক আলোচনা সময়ে,—তাহা আরও একটু—খুলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। জৈনগণ, সিদ্ধদশা-প্রাপ্ত বা মুক্ত জীবাত্মাকে, ঈশ্বর শব্দে ব্যবহার না করিয়াও তত্তুল্য উচ্চভাবে যে দেখিয়া থাকেন, ইহা সুনিশ্চিত। যে জীবাত্মার নিজ-সুকৃতি দ্বারা এমন অত্যুচ্চ অবস্থা লাভ ঘটিতে পারে, সেই জীবাত্মাকে চিন্তা করিয়া সাধারণ জৈনধর্ম্মাবলম্বী শত শত নরনারী প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে

চক্ষু মুদিয়া আত্মধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে, মাগধ-ভাষাতে রচিত এই নিত্যপাঠ্য সুমধুর স্তোত্রটি যে পাঠ করিবেন, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

জৈনের সায়াহ্ন-স্তোত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ—

অহো আত্মা! তুমিই তোমার স্রষ্টা, তুমিই ঘাতক।
তুমিই সর্ব্বসুখ-দাতা আর সর্ব্বদুঃখ-প্রদায়ক।
তুমিই তোমার বন্ধু আর তুমিই তোমার অরি।
পরম হিতৈষী আর পরম অহিতকারী।
তুমিই তোমার বৈতরণী, তুমিই কল্পবৃক্ষ হে তোমার!
তুমিই তব কামধেনু আর স্বরগের সুখশান্তি-দ্বার,
আত্মা হে আমার *!

জৈন বা শিখ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের ন্যায় এদেশের নানাস্থানে আরও নানাবিধ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভিতরের জীব-তত্ত্ব-ঘটিত সিদ্ধান্তের সৌরভ প্রায় সকলগুলিরই একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবাত্মার নিত্যত্ব ও উহার নিজকৃত কর্ম্মফলে, উর্দ্ধ ও অধোগতি-প্রাপ্তি যে সুনিশ্চিত,

* সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ জৈন-জনসাধারণের নিত্যপঠিত মাগধ-ভাষার জীবাত্মা ঘটিত এই স্তোত্র যেমন সুন্দর ও সুললিত, সংস্কৃতজ্ঞ জৈন-পণ্ডিতগণের গীত, সংস্কৃত স্তোত্র-গুলি ততোধিক সুন্দর এবং আরও উচ্চভাবে পরিপূর্ণ;

ইহা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। কেবল ভারতের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত সম্বন্ধেই বা একথা বলি কেন? জগতের সুসভ্য, অসভ্য, যত দেশের যত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের কথাই অনুসন্ধান করিয়া দেখা হউক, তাহাতে ইহাই জানিতে পারা যায় যে,—দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াও যে জীবাত্মা বা প্রাণ বা ভিতরের তদ্রূপ কোন একটা সামগ্রী, কোন না কোন অবস্থাতে কিছু একটা আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে এবং সে অবস্থাতেও তাহার সুখ বা দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকে। ফলতঃ জগতের প্রায় সমস্ত ধর্ম্মমতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিস্তৃতি এই বিশ্বাস হইতেই সমুদ্ভূত বলিতে বাধা নাই। মানবের মৃত্যুর পরে,

উহার একটু পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত চারিটি শ্লোকে পাঠক পাইতে পারিবেন—

"স্বাত্মস্থিতঃ সর্ব্বগতঃ সমস্তব্যাপারবেদী বিনিবৃত্তসঙ্গঃ।
প্রবৃদ্ধকালোঽপ্যজরো বরেণ্যঃ পায়াদপায়াৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥
পরৈরচিন্ত্যং যুগভারমেকঃ স্তোতুং বহন্ যো গিরিভিরপ্যশক্যঃ।
স্তুত্যোঽস্ত মেঽসৌ বৃষভো ন ভানোঃ কিমপ্রবেশে বিশতি প্রদীপঃ।
তত্যাজ শক্রঃ শকনাভিমানং নাহং ত্যজামি স্তবনানুবন্ধং।
স্বল্পেন বোধেন ততোঽধিকার্থং বাতায়নেনেব নিরূপয়ামি॥
ত্বং বিশ্বদৃশ্বা সকলৈরদৃশ্যো বিদ্বানশেষং নিখিলৈরবেদ্যঃ।
বক্তুং কীয়ান্ কীদৃশ ইত্যশক্যঃ স্তুতিস্ততোঽশক্তিকথা তবাস্তু॥"

তাহার জীবাত্মার ভবিষ্যৎ অবস্থা-ঘটিত এইরূপ একটা ধারণা মানুষের হৃদয়ে কোন্ চিন্তা-বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইল এ জটিল প্রশ্নের সুমীমাংসা করিবার জন্য এপর্য্যন্ত এদেশের এবং ইয়োরোপের অনেক প্রাচীন ও আধুনিক প্রতিভাশালী পণ্ডিত, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে ম্যাক্সমুলারের নাম সভ্য-জগতে সর্ব্বত্র বিদিত। ইনি জীবাত্মা সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী-লিখিত উক্তি সকল এবং আধুনিক অভিমত উভয়ই অনুশীলন করিবার যেরূপ সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেরূপ সৌভাগ্য অল্পেরই ঘটিয়া থাকে। কাজেই ইঁহারই কথা প্রথমে আমাদের স্মরণ-পথে আইসে। ম্যাক্সমুলার, তাঁহার কৃত "INDIA : WHAT CAN IT TEACH US" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একস্থানে, পিতৃ-লোকের উপাসনা প্রসঙ্গে এইমর্ম্মে জীবাত্মার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ;—"আর সকল গ্রন্থ অপেক্ষা বেদেই বোধ হয় এতত্ত্ব আমরা ভালরূপ জানিতে পারি যে, পুত্রের হৃদয়ে মৃত পিতা-মাতার প্রতি স্বাভাবিক যে একটা ভালবাসা থাকে, সেই মূলস্থান হইতে মৃত্যুর পরেও যে তাঁহারা রহেন, এমন একটা স্বাভাবিক ধারণা, ক্রমে জীবাত্মার অবিনশ্বরত্বে পরিণত হইয়া উঠে *।" কেহ

* "That common name, Pitris or fathers, gradually attracted towards itself all that the fathers shared in common. It came to mean

কেহ এরূপ সিদ্ধান্তও করিয়া থাকেন যে,—"স্বপ্নে, মৃত আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবকে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ অবস্থাতে তাঁহাদের অভিপ্রায় ও আদেশও অনেক সময়ে জীবিত মানুষের হৃদয়ে অনুভূত হইয়া থাকে; ইহা হইতে মৃত-ব্যক্তির যে মৃত্যুতেই সমস্ত শেষ হয় না, মৃত্যুর পরেও যে তাঁহাদের কিছু থাকিয়া যায়, এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত মানুষে সহজেই করিয়া লইতে পারে।" তাঁহাদের মতে মানুষের পরকাল-ঘটিত ধারণার ইহাই ভিত্তি-ভূমি। কাহারও মতে, "রৌদ্রে মানুষের দেহের অনুরূপ ছায়া পড়িতে দেখিয়া, অশিক্ষিত অসভ্য মানুষের হৃদয়ে প্রথমে, দ্বিতীয় একটা বস্তু থাকিবার চিন্তার উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে; ক্রমে উহা হইতে দেহের মধ্যে দেহের অতিরিক্ত জীবাত্মা থাকিবার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।" এইরূপ সিদ্ধান্ত

---

not only fathers, but invisible, kind, powerful, immortal, heavenly beings and we can watch in the veda, better perhaps than any other else, the inevitable, yet most touching metamorphosis of ancient thought,—the love of the child for father and mother becoming transfigured to into an instinctive belief in the immortality of the soul."

(INDIA: WHAT CAN IT TEACH US.)

সকল, প্রথম পড়িবার সময়ে, অনেকের পক্ষে, আশু চিত্ত-বিনোদক হইলেও, একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে, নিতান্তই অসার প্রতিপন্ন হইবে। রৌদ্রে নিজ-দেহের ছায়া দেখিয়া কিম্বা কূপ-জলে নিজ-মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অথবা পর্ব্বত-গুহায় নিজ-বাক্যের প্রতিধ্বনি শুনিয়া, অশিক্ষিত বর্ব্বরের চিত্ত চিন্তাকুল হইতে পারে সত্য, কিন্তু ঐরূপ চিন্তার সূত্র ধরিয়া জীবাত্মার নিত্যত্ব ও উহার পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর পরিগ্রহণের সিদ্ধান্ত, মানব-হৃদয়ে কিছুতেই আসিয়া স্থান পাইতে পারে না। বরং বেদ এবং উপনিষদে সূর্য্যদেবের উচ্চস্তুতিবাদ-মূলক মন্ত্র পড়িয়া, অনেক সময়ে এরূপ চিন্তা আমাদের মনে উদয় হয় যে—হয়ত' এই সূর্য্য-দেবের উদয়াস্ত ক্রীড়া প্রত্যহ চক্ষুর সম্মুখে সন্দর্শন করিতে করিতে ভাবুক—সাধক কোন কবি ঋষির হৃদয়ে, বেদ-বর্ণিত জীবাত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কোন সময়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া, উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে। যাঁহাকে প্রত্যহ প্রাতে বাল-সূর্য্যরূপে, মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডরূপে (যুবারূপে) এবং সন্ধ্যাসমাগমে বৃদ্ধাবস্থা-প্রাপ্ত মরণমুখী—অস্তগামী তপনরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত রাত্রি যাঁহার মৃত্যু অবস্থার সহিত তুলনা করা হয়, তাঁহাকে পরদিন প্রত্যূষে আবার বালসূর্য্য-রূপে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়া, আবার তাঁহার যৌবনাবস্থা, আবার তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা ও আবার তাঁহার মৃত্যু হইতে দেখিয়া এবং প্রত্যহ চক্ষুর সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বস্তুর এইরূপ

পুনঃপুনঃ গমন ও প্রত্যাগমন দেখিতে থাকিয়া—এই বিরাট-নর্জীর চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া, অন্তর্দ্দর্শী ঋষি কেন, অদূরদর্শী অজ্ঞান অসভ্য বর্ব্বরেরা পর্য্যন্ত, অতি সহজে জীবের নিত্যত্ব ও পুনঃপুনঃ জন্মান্তর-পরিগ্রহণের ভাব হৃদয়ে কতকটা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং হয়ত' করিয়াও থাকিবেন।

আমার মনে হয়, কেবল জীবের নিত্যত্ব ও পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু-সংঘটনের বোধই যে আমরা এই সূর্য্যদেবের উদয়াস্ত-ক্রিয়া হইতে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি, তাহাই নহে, পরন্তু এই সূর্য্যদেবের এই প্রাত্যহিক কার্য্যকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের কাল-জ্ঞান, মহাকাল-জ্ঞান এবং আত্মা ও আত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ পরিমাণে আমরা উপলব্ধি করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি। সংক্ষেপ কথাতে বলিতে চাহিলে, বলা যাইতে পারে—সূর্য্যদেব কেবল আমাদের জড়-জগতের রাস্তাঘাট প্রদর্শক নহেন, সূর্য্যদেব আমাদের মনোজগতেরও পথ-নির্দ্দেশক। এদেশের কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত, সূর্য্যের বা চন্দ্রের প্রতিবিম্ব তরঙ্গান্বিত জলাশয়ে প্রতিফলিত হইতে দেখিয়া, উহার সহিত পরমাত্মার ও জীবাত্মার তুলনা করিয়া আমাদিগকে জীবাত্মার অবস্থা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন *। ইহাতে এই দোষ

* শঙ্করাচার্য্য-কৃত বলিয়া প্রকাশিত "তত্ত্ববোধ" নামক গ্রন্থখানি সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ করিতে উপস্থিত হইয়া অনুবাদক লিখিয়াছেন—

ঘটিয়া যায় যে, সূর্য্যের উষ্ণতা রহিয়াছে, জলস্থিত সূর্য্য-প্রতিবিম্বে তাহা নাই, পরন্তু সূর্য্য সত্য বস্তু, প্রতিবিম্ব অসত্য বস্তু। কাজেই এ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদ সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা অপেক্ষা গগনস্থিত সূর্য্য এবং আমাদের অঙ্গে অনুভূত সূর্য্যকিরণের কথা উল্লেখ করিয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিলে, আমরা হয়ত' কতকটা সত্য অবস্থার নিকটবর্ত্তী হইতে পারি। সূর্য্যমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় ও তেজোময়; যে সূর্য্যকিরণ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি ও অঙ্গে অনুভব করিতেছি তাহাও জ্যোতির্ম্ময় ও তেজোময়,—কেবল নামের শব্দগত পার্থক্যভিন্ন উভয়ের ভিতরে আকার ও গুণগত পার্থক্য কিছুই নাই। এই তেজের মূল উৎসকে কিম্বা এই তেজসমষ্টিকেই "সূর্য্যমণ্ডল" বলিয়া আমাদের মানবীয় ভাষাতে আমরা একটি নাম দিয়া রাখিয়াছি। ঐ তেজের একাংশ, যাহা জড়জগতে নিপতিত হইয়া, তাহাকে উত্তপ্ত করিতে আমরা দেখি, তাহারই নাম আমরা "সূর্য্যকিরণ" রাখিয়াছি। সমুদ্র হইতে, সমুদ্রের জল বাষ্পরূপে আকাশে উঠিয়া মেঘে পরিণত হয় এবং ঐ মেঘ হইতে বৃষ্টি-বিন্দু আকারে আবার

"শরীরাভিমানী জীব, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিশেষ।" জীবাত্মাকে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া এইরূপ আরও অনেক অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন।

তাহাই মাটিতে নিপতিত হইয়া এবং একত্রীভূত হইয়া নদী নামে অভিহিত হয়; ঐ জলই তখন "নদীর জল" নাম পরিগ্রহণ করিয়া উহার মূল জন্মস্থান সমুদ্রেই যাইয়া সম্মিলিত হয়। আমাদের বুঝিবার ও বুঝাইবার সুবিধার্থে ঐ একই জলরূপ বস্তুকে যেমন আমরা সমুদ্রজল, বাষ্প, বৃষ্টিধারা, নদীজল, কূপোদক, পুষ্করিণীজল ইত্যাদি বিভিন্ন মানবীয় ভাষার শব্দে অভিহিত ও পৃথক করিয়া রাখিয়াছি, তেমনি "সূর্য্য" "সূর্য্যকিরণ," "সূর্য্যাতপ" ইত্যাদি কতগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়া একই বস্তুকে আমরা পৃথক্ আকারে রাখিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি মাত্র। বৃষ্টি-বিন্দু ও সমুদ্র-জলের দৃষ্টান্ত, সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্যসম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযুজ্য হইতে পারে না। জলকে আমরা আমাদের দেহের যতগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি, সূর্য্যকিরণকে তাহা পারি না। সূর্য্য হইতে সূর্য্যাতপ বা সূর্য্যকিরণ যেমন ভিন্ন নহে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি, পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাকে কতকটা তেমনি অভিন্নভাবে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। তবে সূর্য্যকিরণ যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য সামগ্রী, আত্মা তাহাও নহে। পরমাত্মা এবং পরমাত্মার তেজ-কণিকা-স্বরূপ আমাদের জীবাত্মা আদৌ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়েরই অনুভব্য বস্তু নহে;—উহা কেবল এক জ্ঞানেরই অনুভব্য। এইজন্য, ইন্দ্রিয়ের অনুভব্য সূর্য্যতেজের সহিতও অতীন্দ্রিয়, কেবল জ্ঞানের অনুভব্য জীবাত্মার তুলনা

ঠিক ভাবে হইতে পারে না। তথাপি, সমুদ্র ও বৃষ্টি-বিন্দুর কথা তুলিয়া যেমন আমরা সূর্য্য ও সূর্য্যতেজের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করি, সেইরূপ সূর্য্য ও সূর্য্যতেজের কথা তুলিয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মার অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। বালকের বর্ণ-পরিচয়-কার্য্যের সুবিধার্থ যেমন তাহার শিক্ষক বর্ণপরিচয় পুস্তকে "অ" অক্ষরের পার্শ্বে "অ" আদি-অক্ষর বিশিষ্ট অজগর বা কোন একটা বস্তুর ছবি চিত্রিত করিয়া রাখেন, সেইরূপ আমাদের মাতৃ-রূপা প্রকৃতিদেবী অধ্যাত্মজ্ঞানের বর্ণ-পরিচয় পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাতে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভাব বুঝাইবার জন্য সূর্য্যদেবকে আঁকিয়া রাখিয়া দিয়াছেন! পাঠ্যপুস্তকের চিত্র দেখিয়া বালকের অক্ষর-পরিচয়ে কিঞ্চিৎ সহায়তা প্রাপ্তির ন্যায়, সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণের কথা চিন্তা করিয়া আমরা জীবাত্মার ভাব হৃদ্বোধ করিবার কিঞ্চিৎ সহায়তা পাইতে পারি মাত্র। বস্তুতঃ, কোন অতীন্দ্রিয় বস্তুকে বুঝিবার জন্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত নহে; কিন্তু যে স্থলে একটি অদৃশ্য বস্তু বুঝিবার জন্য তত্তুল্য আর একটি অদৃশ্য বস্তু, আমরা জগৎ সংসারে খুঁজিয়া পাই না, সে ক্ষেত্রে অদৃশ্য বস্তুকে বুঝিবার জন্য আংশিক সমভাবাপন্ন একটা দৃশ্য বস্তুকে ধরিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করা ভিন্ন আমাদের আর উপায়ান্তর কি আছে? প্রাচীন ঋষিগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই,

তাঁহাদের সঙ্কলিত দর্শন-গ্রন্থে জীবাত্মার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য, তাঁহাদিগকে সমুদ্র-তরঙ্গের, জলে চন্দ্র-প্রতিবিম্বের, কোশস্থিত রেশমকীটের এবং এই শ্রেণীর আরও অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পার্থিব বস্তুর দৃষ্টান্ত আনিয়া উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। এই সকল স্থূল দৃষ্টান্তের সাহায্যে, তাঁহারা কি প্রণালীতে আমাদিগকে জড়-জগতের চিন্তা হইতে ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম-রাজ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পুরে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে বিস্ময়ে বিমোহিত হইতে হয়। একদিকে পাঠকের সময়াভাব, অন্যদিকে আমাদের এই প্রস্তাবের আয়তন ক্ষুদ্র রাখিবার প্রয়োজন, এতদুভয়ে সম্মিলিত হইয়া বাধা উপস্থিত না করিলে, পাঠককে জীবাত্মা ঘটিত প্রাচীন দার্শনিক-তত্ত্বের আলোচনায় বিপুল বিস্ময়ানন্দ কিছুক্ষণ উপভোগের জন্য সাদরে আহ্বান করিতে পারিতাম; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা যখন সম্ভবপর নহে, তখন উহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র এখানে উপস্থিত করিয়াই আমাকে নিরস্ত থাকিতে হইতেছে।

ছয়টি সুপ্রশস্ত দ্বার দিয়া আমরা জীবাত্মার দার্শনিক-তত্ত্বানুশীলন-পুরীতে প্রবেশ করিতে পারি! এই ছয়টি দ্বারের নাম—(১) ন্যায়-দর্শন, (২) বেদান্ত-দর্শন, (৩) পাতঞ্জল দর্শন (৪) মীমাংসা-দর্শন (৫) বৈশেষিক-দর্শন, (৬) সাংখ্য-দর্শন। "প্রধান ছয় দ্বার" এই কারণে বলিতে হইতেছে যে—জীবতত্ত্বানুশীলন-পুরীর ভিতরে প্রবেশের

জন্য এদেশের এবং ইয়োরোপের, আধুনিক এবং প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে আরও বহুলোকে দর্শন-গ্রন্থ লিখিয়া প্রবেশ-দ্বার ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে সকল প্রবেশ-দ্বারের আয়তন এতই সংকীর্ণ যে তাহাকে বাতায়ন, গবাক্ষ বা জানালা নামে অভিহিত করিলেও দোষ হয় না। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিকে, বাতায়ন বা গবাক্ষ পর্য্যন্তও বলা যাইতে পারে না; কারণ, প্রস্তরের দেওয়াল ফুটাইয়া দরজা খুলিবার ব্যর্থ চেষ্টাতেই তাহাদের শোচনীয় পরিসমাপ্তি হইয়াছে। পূর্ব্বকথিত ঋষি-প্রণীত ছয়টি দর্শন ভিন্ন, উলুক্য-দর্শন, রামানুজ দর্শন, রামেশ্বর-দর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন প্রভৃতি আরও অনেকগুলি দর্শন-গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই এবং ইহাদের মধ্যেও স্থানে স্থানে জীবাত্মার কথা লইয়া অল্প-বিস্তর আলোচনা করা হইয়াছে দেখা যায়। উলুক্য-দর্শন প্রভৃতি দার্শনিক আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থগুলিকেই লক্ষ্য করিয়া "জানালা" "গবাক্ষ" শব্দের এখানে অবতারণা করিতে হইয়াছে। ইয়োরোপের প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিত পিথ্যা-গোরাস্, প্লেটো, সক্রেটিস্ অথবা আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ টেট্ ম্যাক্স্ওয়েল, স্পেন্সর, বেন্ ককস প্রভৃতির জীবতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাকেও পূর্ব্বকথিত "জানালা," "গবাক্ষ" স্থানীয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তাঁহাদের কৃত জানালা বা গবাক্ষপথে ভিতরের আলো কিঞ্চিৎ মাত্র আমাদের— বাহিরে দণ্ডায়মান দর্শকের, নেত্রগোচর হইতে পারিলেও

জীবতত্ত্বের নিগূঢ়-রহস্য মধ্যে প্রবেশের দ্বার ঐ সকলকে আমরা বলিতে পারি না। ঋষি-প্রদর্শিত ষড়্দর্শনই উহার সুপ্রশস্ত প্রবেশদ্বার এবং এই ষড়্দর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি গৌতম, মহর্ষি বেদব্যাস, মহর্ষি পতঞ্জলি, মহর্ষি জৈমিনি, মহর্ষি কণাদ ও মহর্ষি কপিলকেই আমরা, আমাদের পথ-প্রদর্শক বলিব। যদিও এই সদামুক্ত ছয় দ্বারের যে কোন দ্বার দিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু স্থূল-জগতের কথার সহিত আমাদের ন্যায় যাঁহারা অধিক সম্বন্ধ রাখিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে মহর্ষি গৌতম-প্রদর্শিত পথটি সমধিক সুগম, এজন্য এই পথ ধরিয়া আমরা প্রথমতঃ কিছুক্ষণ চলিব। সুখের বিষয় এই যে, এই ছয়টি দ্বারই এমন সুকৌশলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখা হইয়াছে যে, উহার যে কোন দ্বার দিয়া যে কেহ ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র পথের পার্থক্য-ঘটিত জ্ঞান আপনা হইতে হ্রাস হইয়া যায়। এখন মহর্ষি গৌতমের দর্শনশাস্ত্রের দ্বারে, বিনতভাবে আমাদের মস্তক প্রবিষ্ট করাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, দ্বারের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই একটি বাহিরের কথার একটু আলোচনা আমাদিগকে করিতে হইতেছে।

এইস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলে, জীবাত্মা ঘটিত একটি গুরুতর চিন্তা স্বভাবতঃই আমাদের চিত্তে ফুটিয়া উঠে। সে চিন্তাটি এই ;—জীবাত্মার নিত্যত্ব যখন বেদ-পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রেই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, আর হিন্দু নরনারী মাত্রেই

যখন এ সিদ্ধান্ত অটল দৃঢ়তার সহিত মান্য করিয়া আসিতেছেন, তখন দার্শনিক বিচারের ভিতরে ইহাকে আবার টানিয়া আনিয়া, যাহা সত্য বলিয়া দশে মানিয়া লইয়াছেন, তাহার সত্যতা সপ্রমাণ করিবার জন্য পরমজ্ঞানী ঋষিগণ এত যত্নও পরিশ্রম করিয়াছেন কেন? মহর্ষি গৌতমের—"প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" উক্তিকে আশ্রয় করিয়া আমরা এ প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিতে পারি। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণের আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন জীবের জীবাত্মার অস্তিত্ব এবং উহার নিত্যত্ব স্থির করিতে পারিবার আর কোনই উপায় নাই। বেদ-পুরাণাদির উক্তিকে যতই আমরা ভক্তিভাবে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত থাকি না কেন, উহা যে শব্দ প্রমাণেরই অন্তর্ভূত একথা স্বীকার করিতেই হইবে। উপরি লিখিত চারি প্রকারের প্রমাণের মধ্যে "প্রত্যক্ষ-প্রমাণ"কেই মহর্ষি গৌতমের মতানুসরণকারী নৈয়ায়িকগণ প্রথম স্থান দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—প্রথমতঃ একটা কিছু প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয়ে যে ধারণা হয়, সেই ধারণাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা পরে আর কোন একটা বিষয়ের অনুমান করিতে পারি এবং পূর্ব্বের প্রত্যক্ষীভূত কোন একটা বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই, আমরা প্রয়োজনস্থলে, উপমা দিতেও সমর্থ হই। যাহা আমরা আমাদের কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা পূর্ব্বে উপলব্ধি করি নাই, এমন কোন বিষয়ের জ্ঞান, কেবল শব্দপ্রমাণ দ্বারা আমরা কখনও আয়ত্ত করিতে

পারি না। রাত্রে ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে কেহ যদি বলে, আকাশে "রটাং" উঠিয়াছে, তাহা হইলে সে শব্দ শুনিয়া আমরা কিছুই ধারণা করিতে পারিব না। কারণ—"রটাং"কে পূর্ব্বে কখনও দেখা হয় নাই, কিন্তু কেহ যদি বলে, আকাশে "চন্দ্র" উঠিয়াছে, তাহা হইলে আমরা ঐ শব্দের তাৎপর্য্য অতি সহজেই হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিব। কারণ, চন্দ্রকে ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেকবার আকাশে উঠিতে দেখিয়াছি। "চন্দ্র" শব্দ শ্রবণদ্বারা, চন্দ্র ঘটিত পূর্ব্বের প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞানটি আমাদের স্মরণ-পথে আবির্ভূত হওয়াতেই এখানে কেবল শব্দপ্রমাণের সহায়তাতে আকাশে চন্দ্র উঠিবার জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারিতেছি। এইরূপ বিচারসূত্র ধরিয়া নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষপ্রমাণকেই সর্ব্বপ্রথম স্থান দিয়াছেন। কিন্তু এখানে কথা হইতেছে,—জীবাত্মার নিত্যত্ব সপ্রমাণ; জীবাত্মা কিএবং কেমন, তাহা সৃষ্টির আরম্ভ কাল হইতে—এ পর্য্যন্ত কেহই কখনও চোখে দেখেন নাই। কাজেই জীবাত্মার প্রত্যক্ষপ্রমাণ, অন্য কেহ পাইয়া, তাঁহার মুখের উক্তি বা শব্দ প্রমাণ দ্বারা উহার অস্তিত্ব আমার নিকটে যে তিনি সপ্রমাণিত করিয়া দিতে পারিবেন, সে সম্ভাবনাও আদৌ নাই। এ অবস্থাতে এখন উপায় কি?

এ প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর এই;—ফল, জল ইত্যাদি যে কোন বস্তুর ইন্দ্রিয়-গ্রহণযোগ্য যে সকল গুণ থাকে,

আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাই কেবল উপলব্ধি করিয়া থাকি। বস্তুর এক একটি গুণ গ্রহণের জন্য, আমাদের এক একটি ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। মধুর—মিষ্টরস আমরা জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি, কর্ণের দ্বারা মধুর—মিষ্টরস আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। সেইরূপ চক্ষু মুদিয়া, কর্ণ ইন্দ্রিয় দ্বারা গোলাপ ফুলের সুন্দর রং আমরা কিছুতেই হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি না। যে বস্তুর রূপ, রস, গন্ধাদি গুণ নাই, তাহাকে আমাদের দেহস্থিত কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। দৃষ্টান্তস্থলে "কাল"কে এখানে উপস্থিত করিতে বাধা নাই। কালের রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, কাল শীতল বা উষ্ণ নহে, কাল দৃঢ় বা কোমলও নহে, কাজেই কালকে আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা দ্বারা কিম্বা হাতে টিপিয়া ধরিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না। ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য বস্তু, এই কালকে কেবল কর্ম্মের জ্ঞানদ্বারা আমরা অন্তঃ-করণে উপলব্ধি করিতে পারি। চৈতন্যময় জীবাত্মাকেও সেইরূপ আমরা, আমাদের দেহের চক্ষু-কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও আমাদের হৃদয়স্থিত বিমল জ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। তেজ হইতে উৎপন্ন আমাদের দেহের চক্ষু ইন্দ্রিয়, তেজ হইতে সমুৎপন্ন স্থূল জগতের নানা বস্তুর লাল, নীল, শ্বেত, পীতাদি রং যেমন গ্রহণ করিতে সমর্থ, আকাশ-অংশ হইতে সঞ্জাত

আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় যেমন আকাশ হইতে সমুৎপন্ন কর্কশ কোমলাদি নানাবিধ শব্দ গ্রহণ করিবার অধিকারী *, সেইরূপ চৈতন্যময় জীবাত্মাকে আমাদের দেহস্থিত বিমল জ্ঞানই কেবল উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এই বিমল জ্ঞানকেই শাস্ত্রীয় ভাষাতে অধ্যাত্ম জ্ঞান বলা হয়। চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়-পথে গৃহীত বাহ্য-বস্তুর ধারণা সমূহ হইতেই ক্রমে আমাদের অন্তঃকরণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠে সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়সঞ্জাত স্থূলজ্ঞান আর অধ্যাত্মজ্ঞান, এক সামগ্রী নহে। জিহ্বা-দন্তে নিষ্পেষিত অন্নাদি খাদ্যের রস যাহা মুখে থাকে এবং সেই রসের পরিণাম যাহা আমাদের দেহস্থিত "ওজঃ" নামে কথিত হয় †, তাহা যেমন এক বস্তু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, সেইরূপ বাহ্য বস্তুর স্থূলজ্ঞানকে আর অধ্যাত্ম জ্ঞানকে এক পর্য্যায়-ভুক্ত করা চলে না। আমাদের অন্তঃকরণের বিচারশক্তিরূপ পাকযন্ত্রে পরিপাক হইয়া, বাহ্যবস্তুর স্থূলজ্ঞান অধ্যাত্মজ্ঞানে পরিণত হয়, বলিতে বাধা নাই। যেরূপ বিচারশক্তির পাকযন্ত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়-

* "গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ।"

(গৌতমীয় ন্যায়দর্শন।)

† "হৃদি তিষ্ঠতি যচ্ছুদ্ধং রক্তমীষৎ সপীতকম্।
ওজঃ শরীরে সঞ্জাতং তন্নাশান্না বিনশ্যতি॥"

(চরক-সূত্রস্থান।)

গৃহীত স্থূলজ্ঞান অধ্যাত্মজ্ঞানে পরিণত হইতে পারে, পশু-পক্ষীদের দেহে সেরূপ পাকযন্ত্র নাই, কাজেই পশু-পক্ষীরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলজ্ঞান পর্য্যন্ত পাইতে পারে, পরন্তু অধ্যাত্ম-জ্ঞান তাহারা লাভ করিতে পারে না। আমাদের অন্তঃ-করণস্থিত এই জ্ঞান যখন সুপ্তভাবাপন্ন থাকে, অর্থাৎ অন্তঃকরণ যখন অজ্ঞানে বা অবিদ্যাতে সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহাতে চিন্ময় আত্মার উপলব্ধি সম্ভবে না, ইহাই বিচার করিয়া, নৈয়ায়িকেরা বলেন—আত্মাকে বুঝিতে চাহিলে অজ্ঞানতাকেই সর্ব্বপ্রথমে বিদূরিত করিতে হইবে। যোগ-দর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি পতঞ্জলিও এই কথাই ভাবান্তর করিয়া বলিয়াছেন *। মহর্ষি বেদব্যাস-প্রবর্ত্তিত বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এই মহান্ উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন,—সমস্ত অনর্থের মূল এই অজ্ঞানকে বিনাশ করিবার জন্যই বেদান্ত-দর্শন প্রতিষ্ঠিত †। দর্শন-দ্বারের বাহিরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জীবাত্মার দুই একটি কথা আলোচনা করিতে করিতে ভাবের প্রবল-প্রবাহে আমাদের

* "অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদরাণাম্॥"

(পাতঞ্জল-দর্শন।)

† "অস্যাঽনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে।"

(বেদান্ত-দর্শনের শাঙ্কর-ভাষ্য।)

অজ্ঞাতসারে আমরা পাঠককে লইয়া, যে কি ভাবে দর্শনশাস্ত্রের সুবিশাল প্রাঙ্গণ-ভিতরে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছি, এখন তাহাই ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। সে যাহাই হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ অপরূপ মন্দিরের ভিতরে কোনক্রমে একটু প্রবেশ করিতে পারিলে, ঋষিগণের মত-পার্থক্য-ঘটিত আমাদের বহুকালের একটা ভুল ধারণা একেবারেই হ্রাস হইয়া যায়। বস্তুতঃ আমরা এখানে আসিয়া দেখিতে পাইতেছি,—জীবাত্মার নিত্যত্বই যে-কেবল ষড়্‌দর্শনে সমস্বরে নির্দ্দেশ করেন তাহাই নহে, পরন্তু আত্মাকে বুঝিতে চাহিলে চিত্তের অজ্ঞানতাকে বা অবিদ্যাকে দূর করিতে হইবে, এ কথাও এক না একভাবে ইঁহারা সকলেই স্বীকার করেন।

কিন্তু এই "অজ্ঞান" শব্দটা লইয়া দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ মহা গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ সিদ্ধান্ত করেন—অবিদ্যা বা অজ্ঞান অর্থে ভ্রমজ্ঞান অর্থাৎ যাহা সত্য নহে, এরূপ যে অন্তঃকরণের কাল্পনিক ধারণা, তাহাই বুঝিতে হইবে। যেমন "আমি" বলিতে যদি কেহ হস্তপদ-যুক্ত দেহটা বুঝেন, তবে তিনি অজ্ঞানে বা মিথ্যাজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছেন, জানিতে হইবে *। কেহ বলেন,—যাহা মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত

---

* "অহঙ্কারোঽহমিত্যভিমানঃ স চ শরীরাদিবিষয়কো মিথ্যাজ্ঞানমুচ্যতে।"

(ন্যায়সূত্রবৃত্তি।)

তাহাই তত্ত্বজ্ঞান *। কেহ বলেন,—যাহা জ্ঞানের বিরোধী তাহাই অজ্ঞান †। কেহ বলেন,—জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান; যেমন আলোর অভাব অন্ধকার। কেহ বা বলেন,—যাহা দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া আমরা আত্মাকে অনুভব করিতে পারি না, তাহাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা মায়া ‡। কেহ বলেন,—যাহা নহে, তাহাই ঠিক বলিয়া প্রতীতি জন্মানই হইতেছে মায়ার কার্য্য §। আর এই মায়ারই নামান্তর হইতেছে—অবিদ্যা বা অজ্ঞান ‖। ভাষ্যকার এবং টীকাকার দার্শনিক পণ্ডিতগণের শব্দার্থঘটিত এইরূপ রাশীকৃত মতভেদকে মন্থন করিয়া "অজ্ঞান" শব্দের নিগূঢ় দার্শনিক অর্থ উদ্ধারের চেষ্টাতে কালক্ষেপ না

* "তত্ত্বজ্ঞানন্তু খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপর্য্যয়েন ব্যাখ্যাতং"
(ন্যায়-দর্শনের বাৎস্যায়নভাষ্য।)

† "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎ কিঞ্চিদিতি"
(বেদান্তসার।)

‡ "ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্।"
(পঞ্চদশী।)

§ "বিসদৃশপ্রতীতি-সাধনং মায়া"
(নাগোজী ভট্ট।)

‖ "তস্যা নামান্তরং যথা—প্রকৃতিঃ, অবিদ্যা, অজ্ঞানং"
(শব্দকল্পদ্রুম।)

করিয়া উহার সহজ ও সরল অর্থই আমরা এস্থলে গ্রহণ করিব। সত্যজ্ঞানের আবরণকেই আমরা এক্ষেত্রে "অজ্ঞান" শব্দের প্রতিপাদ্য মনে করিতে পারি। অন্তঃকরণ হইতে এই "অজ্ঞানের" আচ্ছাদন অপসারণ করিতে পারিলেই আত্মঘটিত যথার্থজ্ঞান আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। কি উপায়ে এই অজ্ঞানের আচ্ছাদন অপসারিত করিয়া আমাদের অন্তঃকরণের বিমলজ্ঞান বা অধ্যাত্ম-জ্ঞান বা তত্ত্ব-জ্ঞান উদ্দীপ্ত করিয়া উঠান যাইতে পারে, মহর্ষিগণ, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত দর্শন-শাস্ত্রে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সমাজের বিভিন্ন অবস্থা-স্তরে সংস্থিত বিভিন্ন রুচি ও অধিকার-সম্পন্ন নর-নারীর জন্য, বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করা প্রয়োজন হওয়াতেই সম্ভবতঃ ছয়জন লোক-মঙ্গলকামী মহাজ্ঞানী মহর্ষি, পৃথক্ ভাবে ষড়্‌বিধ উপায়-ধারা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম তাঁহার প্রবর্ত্তিত ন্যায়দর্শনে, মানবের অন্তঃকরণে সুপদ্ধতিতে পরিচালিত চিন্তাশক্তির বিকাশদ্বারা চিত্তের অজ্ঞানতা দূর করিয়া কি ভাবে আত্ম-জ্ঞানের অনুভূতি করা যাইতে পারে, তাহারই সদুপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন *। এই সকল বিষয়ের আলোচনাতেই

* ন্যায় দর্শনের সর্ব্ব প্রথম সূত্রই হইতেছে—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

ন্যায়দর্শনখানি প্রায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মূল গৌতম-সূত্র দূরে থাকুক, ইহার টীকা টিপ্পনীগুলিও এই কারণে এতই কঠিনবোধ্য যে, গুরুর উপদেশ ভিন্ন কেবল এই সকল পুস্তক দেখিয়া লেখকের অভিপ্রায় পরিগ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য দর্শনের ন্যায় ইহার বঙ্গানুবাদ বা ইংরাজী অনুবাদ আজিও প্রকাশ করা হয় নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার অধ্যাপক স্বর্গীয় পূজ্যপাদ হরিকিশোর তর্কবাগীশ মহাশয় "ন্যায়-পদার্থতত্ত্ব" নামে একখানি অসম্পূর্ণ বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহা এখন অপ্রাপ্য। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, তর্ক, বাদ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ষোলটি বিষয়ের সহায়তাতে সুপদ্ধতিতে চিন্তা করিবার অভ্যাস আয়ত্ত করিয়া, আমাদের অন্তঃকরণে বিমল জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভাসিত করা যাইতে পারে,—এই সিদ্ধান্ত আমাদের এদেশের প্রাচীন ঋষিগণই যে কেবল করিয়াছেন তাহাই নহে, ইয়োরোপের আধুনিক চিন্তাশীল লোকগণও চিন্তা-শক্তির বিকাশের জন্য Argumentation, Disputation, Discussion, Analogy, fallacies ইত্যাদির সহিত পরিচিত হইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। (এ্যাটকিনসন্ কৃত The Art of Logical Thinking দ্রষ্টব্য।)

বঙ্গানুবাদ খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা ন্যায়দর্শনের সাহায্যে জীবাত্মঘটিত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পাইতে পারিবেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি, তাঁহার প্রবর্ত্তিত যোগদর্শনে, আত্মা সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনের উক্তির আংশিক সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে,—বাহ্য ও অন্তরশুদ্ধি হইবার পরে, সৌমনস্য বা খেদশূন্য মনঃপ্রীতি উৎপন্ন হয়, তৎপরে একাগ্রতা জন্মে, আর একাগ্রতা জন্মিবার পরে ইন্দ্রিয়-জয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উপরে অন্তঃকরণের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব জন্মে; এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে তখন আত্ম-দর্শনে যোগ্যতালাভ হয় *। কেবল তর্কবিতর্ক, চিন্তা ও বিচারদ্বারা অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি হইতে পারিলেও আত্মাকে উপলব্ধি করিবার যখন উপায় নাই, তখন পূর্ব্ব-লিখিত পন্থা অবলম্বন দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া আত্ম-সন্দর্শনের যোগ্যতা লাভ করাই একান্ত আবশ্যক। এজন্য যোগমার্গই হইতেছে ইহার প্রকৃষ্ট উপায়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন,—তপস্যা দ্বারা শরীর এবং ইন্দ্রিয়গণের অশুদ্ধি ক্ষয় করা যায় †। তপস্যার মধ্যে প্রণব জপকে এবং প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানকে ইনি অতি

---

* "সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি।"
(পাতঞ্জলদর্শন।)

† "কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ।" (ঐ।)

উচ্চস্থান দিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি দৃঢ়তার সহিত ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—শুদ্ধচিত্ত হইয়া বেদোক্ত ঈশ্বর-বাক্য এই প্রণব * নিয়ত জপ ও চিন্তা করিতে থাকিলে, নিজ-দেহমধ্যে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই জানা যাইতে পারে †। আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ-সাধক ন্যায়দর্শনের চারিটি বস্তু স্থলে সংক্ষেপ করিয়া এই দর্শনকার তিনটি বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদ ‡। পাতঞ্জলদর্শনের অনুবাদ অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে যে কোন একখানি সংগ্রহ করিয়া, পাঠক ইচ্ছা করিলে এতৎ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য অবগত হইতে পারিবেন §।

মহর্ষি জৈমিনি, ন্যায় এবং যোগদর্শনের দুর্গম পথ, দুর্ব্বল-চিত্ত ও ক্ষীণদেহধারী মানুষের পক্ষে দুরারোহ হইবে, আশঙ্কা

---

* "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" (পাতঞ্জলদর্শন।)

† "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" এবং "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়া ভাবশ্চ।" (ঐ।)

‡ "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি" (ঐ।)

§ এলাহাবাদ পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

Aphorisms of Joga by Patanjali with the commentary of Vyasa and the gloss of Vachaspati Misra.

করিয়াই হয়ত' তাঁহার প্রবর্ত্তিত মীমাংসা-দর্শনে অপেক্ষাকৃত সহজগম্য আর একটি মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। ইনি, বেদ-বিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মানুষের চিত্তশুদ্ধি লাভ ও তাহা হইতে মানুষের পরম অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া এতৎসম্বন্ধীয় বিষয় সকলেরই সম্যক্ আলোচনা মীমাংসা-দর্শনে করিয়াছেন। বেদোক্তির স্থল-বিশেষের জটিলতা মীমাংসা করিয়া, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের পদ্ধতি-প্রকরণ নির্দ্দেশ করা কার্য্যেই এই দর্শনের অধিকাংশ স্থান নিয়োজিত করা হইয়াছে। এই দর্শনে কর্ম্মানুষ্ঠানেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। জীবাত্মার নিত্যত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা ইহাতে দেখিতে না পাইলেও কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবের ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্তির অনুকূলে অনেক কথা মীমাংসা-দর্শনে রহিয়াছে। এজন্যও জীবতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এ দর্শনখানিও দেখিতে পারেন। বারাণসী সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝাঁ, মহর্ষি জৈমিনি-কৃত মীমাংসা-দর্শনের মূল এবং উহার ইংরাজী অনুবাদ কিছুদিন হইল প্রকাশ করিয়াছেন *। মীমাংসা-দর্শনের যতগুলি বাঙ্গালা, হিন্দী ও

---

* মীমাংসাদর্শনের অনুবাদের ভূমিকাতে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝাঁ লিখিয়াছেন—

"From the earliest times, Indian philosophers have laid stress upon KARMA, action

ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

মহর্ষি কণাদ, তাঁহার প্রবর্ত্তিত "বৈশেষিক-দর্শনে," মহর্ষি জৈমিনির উক্তি,—বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন এবং মহর্ষি পতঞ্জলির উক্তি,—যোগানুষ্ঠান দ্বারা আত্মানুভূতি

---

and Jnana, knowledge as essential for men. Among the six well-known "Philosophical systems," which are to be regarded as so many distinct 'desciplines' rather than 'Philosophies',—we find that, though one may incidentally lay greater stress upon 'Knowledge' than 'Action,' they all agree in maintaining that, though the direct cause of Final Release is knowledge alone—and on this point practically all are agreed—the performanance of actions also is a necessary preliminary step."

উদ্ধৃত ইংরাজী কয়েক পংক্তির তাৎপর্য্য এই—অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশের দার্শনিকগণ, জ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয়কেই মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ষড়্দর্শনশাস্ত্রে যদিও জ্ঞানের উপরেই অধিক সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানটা যে অত্যাবশ্যক প্রাথমিক বস্তু, একথাও সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

লাভের সুগমতা, এই দুইকেই পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করিয়াছেন *। মহর্ষি জৈমিনি-প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্রে নানারূপ বিচার করিয়া ইহাই সার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে,—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা এবং মন এই নয়টি ভিন্ন জগৎসংসারে আর কোন মৌলিক বস্তু নাই এবং হইতে পারে না †। এই দর্শনে "জীবাত্মা" এবং "পরমাত্মা" উভয়কেই একই "আত্মা" শব্দের অর্থের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান হইয়াছে,—যেমন মাটির ঘট, কলসী, কোটরা ইত্যাদি মাটি ভিন্ন কিছুই নহে, অথচ ক্ষিতি শব্দে আমরা মাটির কলসী বুঝি না এবং মাটির ঘট শব্দেও আমরা ক্ষিতি বুঝি না, সেইরূপ পরমাত্মা এবং জীবাত্মা এক আত্মত্বধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু হইলেও পরমাত্মা বলিতে

---

* মহর্ষি কণাদের একটি সূত্রে কথিত হইয়াছে,—"বুদ্ধিপূর্ব্ববাক্যাকৃতির্ব্বেদে" টীকাকারগণ ইহার অর্থ করিয়াছেন,—বেদে যে সকল বাক্য দেখা যায়, তাহা বুদ্ধি বা চৈতন্য দ্বারাও যখন সম্পূর্ণ সমর্থিত হইতেছে, তখন তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার আর একটি সূত্র এই,—"আত্মন্যাত্ম-মনসোঃ সংযোগ-বিশেষাদাত্ম-প্রত্যক্ষম্।" ইহার এইরূপ অর্থ করা হয়,—আত্মা ও মন, উভয়ের সংযোগ বিশেষ (যোগ) দ্বারা আত্মা প্রত্যক্ষ করা যায়।

† "পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।" (বৈশেষিক দর্শন।)

আমরা পরম চৈতন্যময় বা পরমেশ্বরস্বরূপ এক বস্তু বুঝি, আর জীবাত্মা বলিতে অসংখ্য জীবদেহ সম্বন্ধযুক্ত অসংখ্য আত্মা বুঝিয়া থাকি। মহর্ষি কণাদ, তাঁহার দর্শনের একস্থানে একটি সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ব্যবস্থাতো নানা"। ইহা ধরিয়া টীকাকারগণ বলেন, বিচার এবং ব্যবস্থার জন্য জীবাত্মার বহুত্ব স্বীকার্য্য, কেননা এক বলিতে হইলে অসংখ্য দেহে সংস্থিত চৈতন্য একসময়ে জন্মদ্বারা উদ্ভব হইত এবং মৃত্যু দ্বারা লুপ্ত হইত; তাহা না হইয়া যখন একই সময়ে কোথায়ও কাহারও জন্ম, কাহারও মৃত্যু, কাহারও স্বর্গ-প্রাপ্তি, কাহারও নরকে গমন, কাহারও সুখভোগ কাহারও দুঃখভোগ দেখা যাইতেছে এবং অসংখ্য মানব একই সময়ে, অসংখ্য ভাবে, অসংখ্য বিষয়ে চিন্তা করিতেছে, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেহের অধিষ্ঠাতা, ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ইঁহাদের সিদ্ধান্তানুসারে আমাদের সুখ-দুঃখভোগের কারণ হইতেছে—বিষয়ের সহিত প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগ। এই তিনটি সংযোগসূত্রের প্রবাহ বা ধারার মধ্যে যে কোন একটি বিচ্ছিন্ন হইবামাত্র আমরা আর সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারি না। "মন" যখন ইন্দ্রিয়সংযোগের তার হইতে খুলিয়া বসিয়া আত্মাতে স্থিত হয় অর্থাৎ সংযুক্ত হয় তখন দুঃখভোগ করিবার শক্তি আর আমাদের থাকে না। এই অবস্থাতে উপনীত হইলে

মনে দেহান্তর গ্রহণের বাসনার অভাব হয়, কাজেই জন্মান্তর পরিগ্রহণও আর ঘটে না। ইহাই হইল বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তানুসারে "জীবাত্মার মুক্তি" বা "মোক্ষ-অবস্থাপ্রাপ্তি * ।"

মহর্ষি বেদব্যাস, তাঁহার প্রবর্ত্তিত "ব্রহ্মসূত্রে"—যাহাকে সাধারণতঃ "বেদান্তদর্শন" বলা হয়, তাহাতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আত্মার প্রকৃততত্ত্ব জানিবার জন্য বেদশাস্ত্র ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তিনি বলেন—তর্ক-বিতর্ক, প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তিপ্রমাণ, চিন্তা, গবেষণা এ সকল কিছু দ্বারাই অবোধ্য বস্তু আত্মাকে প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিবার উপায় নাই। আত্মা সম্বন্ধে বেদবাক্যই আমাদের একমাত্র সম্বল। যিনি বেদবাক্য মান্য করেন না, তাঁহাকে আত্মার নিত্যত্ব মানাইবার অন্য উপায় নাই। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বেদব্যাস বলিয়াছেন—শাস্ত্র অর্থাৎ বেদবাক্যের প্রভাবেই আত্মা অনুভব্য—শাস্ত্রদ্বারেই আত্মা প্রতিপাদ্য †। এই

* "তদাভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবকশ্চ মোক্ষঃ।"
(বৈশেষিক দর্শন।)

মহর্ষি কণাদের প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে জীবাত্ম-ঘটিত অন্যান্য তথ্য জানিতে ইচ্ছা করিলে, এলাহাবাদ পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "The Vaiseshika-sutras of Kanada with Commentaries" দেখিতে পারেন।

† "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" (বেদান্তদর্শনের তৃতীয় সূত্র।)

পরমজ্ঞানী মহর্ষি আরও বলেন যে,—"জীবাত্মা"ও যাহা, "পরমাত্মা"ও তাহাই; অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা পৃথক্ বস্তু নহে। কেবল ইহাই নহে, পরমাত্মা বা পরম-ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই। নর, নারী, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র যত কিছু আমরা দেখিয়া থাকি, এ সমস্তই মিথ্যা, কেবল স্বপ্নের অনুভবের ন্যায় একটা কাল্পনিক অনুভব মাত্র। মায়া দ্বারা পরমাত্মা সমাচ্ছন্ন হইলে এই স্বপ্নবৎ অবস্থা সমুৎপন্ন হয় *। এই অবস্থা প্রাপ্ত পরমাত্মাই শাস্ত্রীয় ভাষায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ঈশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। এই অবস্থা-প্রাপ্ত পরমাত্মাই দেব, দেবী, নর, নারী, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ নামে কথিত হয়েন। ফলকথা এই যে,—মায়ামুক্ত জীবাত্মাই পরমাত্মা। মায়াযুক্ত পরমাত্মাই জীবাত্মা। একখানি বস্ত্র পরিহিত পুরুষ, আর বস্ত্র-বিবর্জ্জিত সেই উলঙ্গ পুরুষ যেমন দুইটি স্বতন্ত্র মানুষ নহে, তেমনি মায়ামুক্ত আত্মা এবং মায়াযুক্ত আত্মা দুই নহে—একই। তৎপরে বেদান্তদর্শন-প্রবর্ত্তক মহর্ষি বেদব্যাস, কিরূপে এই মায়ার আবরণ বিদূরিত করিয়া পরমাত্মাবস্থাতে,—অর্থাৎ আমাদের খাঁটি

---

* সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" এবং "মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্নেনানভি-ব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।" এই দুই সূত্রের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা-কালীন টীকাকারেরা বলিয়াছেন—স্বপ্নই এই সৃষ্টির মূল এবং মায়াকেই এই স্বাপ্নিকী সৃষ্টির কারণ বলিতে হইবে।

নিজ অবস্থাতে আমরা পৌঁছিতে পারি, এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। তথাপি সত্যানুরাগী বেদ-ব্যাসকে, সত্যের অনুরোধে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মসূত্রের উপসংহার-ভাগে বাধ্য হইয়াই একথা বলিতে হইয়াছে যে—ব্রহ্ম বস্তু অব্যক্ত *। যাঁহারা বেদান্তদর্শনের এই সকল তথ্য বিস্তারিতভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন, অথচ ইংরাজী গ্রন্থ ভিন্ন মূল ব্রহ্মসূত্র এবং তাহার শাঙ্করভাষ্য পড়িয়া বুঝিবার যাঁহাদের সুবিধা নাই, তাঁহারা পণ্ডিত জর্জ্জ থিবোংসঙ্কলিত বেদান্ত-দর্শনের ইংরাজী অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন †। বেদান্তসম্বন্ধীয় অনেকগুলি ইংরাজী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; অধিকাংশের অনুবাদই বিশুদ্ধ নহে, তবে সাধারণকে বুঝাইবার জন্য উপরি উক্ত গ্রন্থকার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়াই, তাঁহার গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করিলাম।

মহর্ষি কপিল, তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাঙ্খ্যসূত্রে, বেদান্ত-দর্শনোক্ত অব্যক্ত পরমাত্মার কথাতে কালক্ষেপ করা অপেক্ষা পরিব্যক্ত এবং পরিদৃশ্যমান এই জগৎসংসারের স্থূল বিষয়ের আলোচনা ধরিয়া সূক্ষ্মতত্ত্বাভিমুখে গমন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছেন; আর এই কারণেই বোধ হয় তিনি এই

---

* "তদব্যক্তমাহ হি।" (বেদান্তদর্শন।)

† The Vedanta-Sutra with Sankar's Commentary by George Thibaut.

সূত্রটি রচনা করিয়া রাখিয়াছেন যে,—"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে।" টীকাকারেরা এই সূত্রের অর্থ করিয়াছেন—"যুক্তি তর্কদ্বারা দিক্‌ভ্রম বিদূরিত হয় না; কেবল সূর্য্যাদি চাক্ষুষ বস্তু দর্শন দ্বারাই ইহা দূর হয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছে, তাহাকে ধরিয়াই আমাদের সিদ্ধান্ত গঠন করিতে হইবে। মহর্ষি কপিল আরও স্থির করিয়াছেন—ত্রিবিধ গুণ-দ্বারা বিশ্বসংসার পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। এই গুণত্রয়কে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই হইতেছে, অব্যক্ত প্রকৃতি *। উহার বৈষম্যই হইতেছে প্রকৃতির বিকৃতি। প্রকৃতি, বিকৃত-দশাতে উপস্থিত হইলেই তখন তাহাকে বলা হয় ব্যক্ত প্রকৃতি এবং তখনই জগৎ সৃষ্টির সূত্রপাৎ হয়। বিকৃতদশা-প্রাপ্ত প্রকৃতির প্রথম ব্যক্ত ভাবকেই তিনি বলিয়াছেন,—"মহত্তত্ত্ব।" এই ব্যক্ত বা মহত্তত্ত্ব অবস্থা হইতে অহংতত্ত্ব বা "অহঙ্কার" উদ্ভাসিত হইয়াছে। অহঙ্কার হইতে "আমি" জ্ঞান এবং "আমি কর্ত্তা"ও "আমি কার্য্য করিব" এরূপ ইচ্ছা, মন, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ তন্মাত্র), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে

---

* "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।"

(সাঙ্খ্যদর্শন।)

পঞ্চ মহাভূত (আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও ক্ষিতি) সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহাদিগের প্রত্যেকটিকে তিনি "তত্ত্ব" সংজ্ঞা দিয়াছেন। মহর্ষি কপিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে জগৎস্থষ্টির সারভূত বস্তুই হইতেছে পূর্ব্বকথিত এই চব্বিশটি তত্ত্ব। এতদ্ভিন্ন "পুরুষ বলিয়া আর একটির অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই "পুরুষ" নামধেয় বস্তুকে কেহ কেহ তত্ত্বাতীত বলিয়া থাকেন; কিন্তু "সাঙ্খ্যদর্শনে "পুরুষ" সহ পঞ্চবিংশতি "গণ" সংখ্যা করা হইয়াছে *। এখানে এই "পুরুষ" শব্দের অর্থে,—হস্ত, পদ, মস্তক ও উদর-বিশিষ্ট একটি পুরুষ মানুষ যাহা আমরা বুঝিয়া থাকি, তাহা বুঝিতে হইবে না। হস্ত-পদ-বিশিষ্ট স্ত্রীপুরুষের দেহরূপ পুর-মধ্যে যে অদৃশ্য বস্তু অবস্থিতি করেন, সেই জীবাত্মাকেই এখানে "পুকষ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বেদাদির মধ্যেও আত্মা অর্থেই "পুরুষ" শব্দ অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে †। মহর্ষি কপিল এই পুরুষ বা আত্মাকেই বিশ্বসৃষ্টির বীজস্বরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি এই "পুরুষ" সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি সকল করিয়াছেন,—পুরুষ শরীরাদির অতিরিক্ত ‡। পুরুষ

---

* "প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোহহঙ্কারো হহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রা-ণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতি র্গণঃ।" (সাঙ্খ্যদর্শন।)

† ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্ত মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

‡ "শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্।" (সাঙ্খ্যদর্শন।)

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ত্রিগুণাতীত *। পুরুষ যখন গুণাতীত বা নির্গুণ, তখন চিদ্ধর্ম্মী বা চৈতন্যধর্ম্মীও তাঁহাকে বলা যাইতে পারে না †। পুরুষ স্বয়ং চৈতন্য গুণবিশিষ্ট না হইলেও সুষুপ্তি, জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন, এই অবস্থাত্রয়ের অনুভাবক, দর্শক বা সাক্ষী-স্বরূপ ‡। যাঁহার নিজের চৈতন্যরূপ গুণ নাই, তিনি অন্যের কার্য্যের বা অবস্থার সাক্ষী-স্বরূপ কিরূপে হইতে পারেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু মহর্ষি কপিল ইহাকে কিয়ৎপরিমাণে আমাদের বোধগম্য করিবার জন্য বলিয়াছেন— মণি নিজে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও রং-শূন্য হইয়াও যেমন চতুষ্পার্শ্বস্থ পুষ্পের বর্ণে নিজ-অঙ্গ রঞ্জিত করে, তেমনি পুরুষ স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও প্রকৃতির গুণে আপনাকে রঞ্জিত করিয়া রাখেন। প্রকৃতি বোধগুণযুক্তা,—অর্থাৎ পুরুষের সুখ দুঃখ নাই, সুখ-দুঃখাদি-বোধ প্রকৃতিরই হয়। প্রকৃতির সুখ দুঃখ-বোধ, মণিতে পুষ্পের বর্ণ প্রতিবিম্বিত হইবার ন্যায় পুরুষে প্রতিফলিত হয় মাত্র §। প্রকৃতি মহত্তত্ত্বরূপে যখন ব্যক্ত হয়েন, তখন তাঁহাকে মহান্, বুদ্ধি, আসুরী, মতি, খ্যাতি জ্ঞান, প্রজ্ঞা প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করা হয় ‖।

---

* "ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ।" (সাংখ্যদর্শন।)

† "নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্ম্মা।" (সাংখ্যদর্শন।)

‡ "সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্।" (ঐ)

§ "কুসুমবচ্চমণিঃ।" (ঐ)

‖ "শঙ্করাচার্য্যের গুরু গৌড়পাদ-কৃত সাংখ্যকারিকার ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"প্রকৃতেঃ সকাশান্মহানুৎপদ্যতে,

পুরাণাদি গ্রন্থে প্রকৃতিকে পরমা শক্তি বলিয়া যেখানে স্তুতি করা হইয়াছে, সেখানেই তিনি যে চৈতন্যময়ী এ কথাও পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে *। দিয়াশলাই জ্বালিয়া তৈল-সলিতা সংযুক্ত প্রদীপে ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা স্পর্শ করাইবামাত্র যেমন উহা জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা হইতে দীপ্তি প্রকাশ পাইতে থাকে, আর তৈল, সলিতা না থাকিলে যেমন শুধু দীপশিখা একনিমেষও তিষ্ঠিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতি-প্রদীপে পুরুষরূপ অগ্নি সংযোগেই চৈতন্যরূপ দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়, মনে করা যাইতে পারে। ব্যক্ত-প্রকৃতিরূপ প্রদীপবিহীন হইলে শুধুই আত্মাতে চৈতন্যজ্যোতিঃ একনিমেষও তিষ্ঠিতে পারে না। সাংখ্য-দর্শনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহাও বলিতে বাধা নাই যে,—প্রকৃতির প্রদীপে, কালের তৈল এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-ময় কর্ম্মের ত্রিপাকে গ্রথিত সলিতাতেই আত্মার চৈতন্য প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। এইগুলির সংযোগের অভাবস্থলে আত্মার অস্তিত্ব সত্ত্বেও জগৎসংসার—অচেতন, অন্ধকার। উপরি লিখিত দৃষ্টান্তে বাতির তৈলরূপ কালের কথা উত্থাপন

মহান্ বুদ্ধিরাসুরী মতিঃ খ্যাতির্জ্ঞানং প্রজ্ঞা পর্য্যায়ৈ রুৎপদ্যতে তস্মাচ্চ মহতোঽহঙ্কারঃ—"

* "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ—দেবীমাহাত্ম্য।)

করাতে আর একটা গোল আসিয়া দাঁড়াইল,—সাঙ্খ্যদর্শনের ২৪ তত্ত্বের মধ্যে কালের উল্লেখ নাই, কাজেই অনেকে মনে করিতে পারেন—মহর্ষি কপিল কালের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি কালের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। সাঙ্খ্যদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বাদশ সংখ্যক সূত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি, এখানে তিনি দিক্, কাল ও আকাশের উল্লেখ করিয়াছেন এবং টীকাকারগণ ঐ সকলকে নিত্য বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এ অবস্থাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে,—মহর্ষি কপিল কালাদিকে পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত না করাতে উহা প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ফলতঃ আত্মা হইতে কাল ও চৈতন্যাদিকে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। আর একটি কথা এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে;—সাঙ্খ্যদর্শনকে আশ্রয় করিয়াই যে জৈনধর্ম্মমত পরিপুষ্ট হইয়াছে, এ কথা এই প্রস্তাবের স্থানান্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে। জৈন-সম্প্রদায়ের একখানি প্রধান দার্শনিক গ্রন্থে অতি পরিষ্কারভাবে জীবাত্মাকে এবং কালকে অভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে *। জৈন-দর্শনের টীকাকারগণ, এক এবং অখণ্ড

* জৈনসম্প্রদায়-সমাদৃত "সময়সার" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—
"জীবো চরিত্ত দংসণণাণট্টিদ তং হি সসময়ং জাণ।"
পণ্ডিত জয়চন্দ্র-কৃত ইহার ভাষানুবাদ—
"জো য়হ জীব নামা পদার্থ হৈ ব হী সময় হৈ॥"

কালকে, তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ-বর্ণিত অসংখ্য জীবাত্মার সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করিতে উপস্থিত হইয়া, কালের অখণ্ডত্ব সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা, বেদান্তবিদ্‌দের পথ অনুসরণ করিয়া, এক পরমাত্মার প্রতিবিম্বে অসংখ্য জীবাত্মার উপলব্ধির ন্যায়, এক কালের প্রতিবিম্বে অসংখ্য কাল-রূপী জীবের স্থিতি সিদ্ধান্ত করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে,—খণ্ডকালই জীবরূপে জগৎ-পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে সাঙ্খ্য-কারিকার ভাষ্যকার খণ্ডকালের এরূপ অভিব্যক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহার সিদ্ধান্তের মর্ম্ম এই যে,—কাল পঞ্চভূতের মূল হইলেও, কাল জগৎসংসারের একটি কারণ হইলেও এবং জগতের সুষুপ্তি বা প্রলয় অবস্থাতে কালই একমাত্র জাগ্রত রূপে বিরাজিত থাকিলেও, কালকে জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ বলা যাইতে পারে না, কেন না, কাল—নির্গুণ। নির্গুণ পুরুষ হইতে যেমন ত্রিগুণ বিশিষ্ট জগতের উদ্ভব হইতে পারে না, তেমনি নির্গুণ কাল হইতে জগদুৎপত্তি সম্ভবে না। অতএব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেই ত্রিগুণ-বিশিষ্ট ত্রিভুবন সমুদ্ভূত, সিদ্ধান্ত করিতে হইবে *। সাঙ্খ্য-

* কালঃ পঞ্চাস্তি ভূতানি কালঃ সংহরতে জগৎ। কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ। ব্যক্তমব্যক্তপুরুষাস্ত্রয়ঃ পদার্থাস্তেন কালোঽন্তর্ভূতোঽস্তি স ব্যক্তঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাৎ কালস্যাপি প্রধানমেব কারণং স্বভাবোঽপ্যত্রৈব লীনঃ

দর্শনের নির্দ্দেশ অনুসারে, আত্মা বা পুরুষ এক নহে; উহা বহু *। আত্মা বহু হইলেও সৃষ্টির প্রারম্ভে,—মহত্তত্ত্বের উদ্ভব সময়ে, সমষ্টিভাবে, সর্ব্বব্যাপী ঐ মহান্ আত্মা প্রকৃতিতে সংযুক্ত থাকিয়া প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করান †। সাঙ্খ্য-দর্শনের এই সিদ্ধান্তটীকে গৌড়পাদ, তাঁহার ভাষ্যে, একটি সাধারণ-বোধ্য অতি সহজ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে যেমন সর্ব্বজীবের সন্তানোৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে বিশ্বসৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন হয়। সাঙ্খ্যদর্শনের এই সিদ্ধান্তটি আমাদের শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণের নানাস্থানে, নানাবিধ প্রস্তাবের মধ্যে, ভাব ও শব্দবৈচিত্র্যে সুরঞ্জিত হইয়া, কোথায়ও অর্দ্ধস্ফুট, কোথায় বা পূর্ণ-বিকশিত রক্ত কমলের ন্যায়, পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের

তস্মাৎ কালো ন কারণং। নাপি স্বভাব ইতি। তস্মাৎ প্রকৃতিরেব কারণং, ন প্রকৃতেঃ কারণান্তরমস্তীতি।" (সাঙ্খ্য কারিকার গৌড়পাদ-ভাষ্য।)

* "পুরুষ-বহুত্বং ব্যবস্থাতঃ। (সাঙ্খ্যদর্শন।)

† "কিং চান্যৎ তৎকৃতঃ সর্গস্তেন সংযোগেন কৃতস্তৎকৃতঃ সর্গঃ সৃষ্টিঃ। যথা স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগাৎ সুতোৎপত্তিস্তথা প্রধানপুরুষ-সংযোগাৎ সর্গস্যোৎপত্তিঃ।" (গৌড়পাদভাষ্য)।

উক্তিতে "স দ্বিতীয়মিচ্ছতি" এবং "অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নীতি" ইত্যাদি যখন আমরা দেখিতে পাই, তখন এই সকল উক্তির ভাবের প্রতিবিম্ব সাঙ্খ্যদর্শনের ঐরূপ সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হইয়াছে মনে করিতে ইচ্ছা হয়। বেদের এই সংক্ষিপ্ত উক্তিকেই আর একটু পরিস্ফুট করিয়া পুরাণে কথিত হইয়াছে,—পরমাত্মা, আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গকে পুরুষ এবং বাম অর্দ্ধাঙ্গকে প্রকৃতিরূপে প্রকাশ করিলেন। সেই প্রকৃতি—ব্রহ্মরূপিণী, মায়াময়ী, নিত্যা এবং সনাতনী। যেখানে অগ্নি সেখানেই যেরূপ তাহার দাহিকা শক্তি থাকে, সেইরূপ যেখানে আত্মা সেখানেই শক্তি এবং যেস্থানে পুরুষ সেইস্থানেই প্রকৃতি বিরাজিত থাকেন *। শ্রীমৎ ভগবদ্গীতায়, শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে, ইহা আরও

---

* "যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধা রূপো বভূব যঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতঃ॥
সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ মায়া নিত্যা সনাতনী।
যথাত্মা চ যথা শক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ।)

"নারদ-পঞ্চরাত্র" গ্রন্থেও এইভাবের উক্তি রহিয়াছে; যথা—
"এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধা রূপো বভূব যঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ।"

পরিষ্কৃত ও পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে *। তন্ত্রোক্ত "শিবশক্তি" এই "পুরুষ-প্রকৃতি"র নামান্তর বলিয়াই কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন,—সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রটাই সাঙ্খ্য-দর্শনের ভিত্তিভূমির উপরে সংস্থিত †। ইহা ঠিক নহে। বেদে ও

---

* শ্রীমৎভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পরমাত্মভাবে ভাবান্বিত করিয়া, অর্জ্জুনকে নিগূঢ় সৃষ্টিতত্ত্ব এইভাবে বুঝাইয়াছিলেন—

"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য,—হে কৌন্তেয়, মহৎপ্রকৃতিরূপা প্রসব-পথেই পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় মূর্ত্তি সমাগত হয় এবং আমিই তৎসমস্তের বীজপ্রদাতা পিতা।

নারদ পঞ্চরাত্রের আর একস্থানে উক্ত হইয়াছে—

"স্ত্রীজাত্যধিষ্ঠাত্রীং দেবীং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীং।"
তৎপ্রাণাধিষ্ঠাত্রীং দেবীং তদ্বামাঙ্গ-সমুদ্ভবাং ॥

উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য—স্ত্রীজাতীয় সমস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মূলপ্রকৃতিরূপা পরমেশ্বরী, যিনি তাঁহার (বিষ্ণুর) প্রাণেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার বামাঙ্গ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন।

† এইরূপ ভ্রম ধারণাটিকে নিতান্ত আধুনিক বলা যাইতে পারে না। আকব্বর বাদসাহের সময়ে, তাঁহারই আদেশে, হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া উহার

পুরাণাদির অনেকস্থানে পুরুষ ও প্রকৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় *। সাঙ্খ্যদর্শনের বর্ণিত চতুর্বিংশতি তত্ত্বেরও উল্লেখ কোন কোন পুরাণে রহিয়াছে †। এই হেতুতে যেমন বেদ-পুরাণাদিকে সাঙ্খ্য-দর্শনের অনুবর্ত্তী বলা

সংক্ষিপ্ত বিবরণ "আইন আকবরী" নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই প্রাচীন গ্রন্থের এক স্থানে সাঙ্খ্যমতের আলোচনা উপলক্ষে কথিত হইয়াছে—এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সকল ষাটখানি তন্ত্র-গ্রন্থের অন্তর্ভূত করিয়া রাখা হইয়াছে।

"The doctrines of this sect are contained in sixty books which they call Tantras"

(AYEEN-AKBERY. English translation by Mr. Francis Gladwin.)

* "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে, "প্রকৃতি"শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এইভাবে করা হইয়াছে—

"গুণে প্রকৃষ্টসত্ত্বে চ "প্র"শব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি "কৃ"শ্চ "তি"শব্দস্তমসি স্মৃতঃ॥
ত্রিগুণাত্ম-স্বরূপা যা সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে॥"

† "কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতি-তত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ॥"

(ভাগবত।)

চলে না, সেইরূপ তন্ত্রে প্রকৃতি পুরুষের কথা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রকেও সাঙ্খ্য-দর্শনের আশ্রিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। ষড়্-দর্শনে বর্ণিত কোন কোন প্রস্তাব লইয়া পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র এবং উপনিষদের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গাধীনে আলোচনা করা হইয়াছে দেখিয়া ঐ সকল মতের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হওয়া ভিন্ন আর কিছুই সিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি, ষড়্-দর্শনেই বেদের প্রামাণ্য ও প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং ষড়্-দর্শনেই একবাক্যে বেদকে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; আর আমাদের স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণাদি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রই যখন সেই বেদ-মূলক, তখন উঁহাদের কাহাকেই কোন এক দর্শনশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী বা আশ্রিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না। বরং তন্ত্রের এবং উপনিষদের উক্তির মধ্যে আত্মতত্ত্ব এবং সৃষ্টি-তত্ত্বের সূক্ষ্ম দার্শনিক বীজ সকল যাহা নিহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টাই সাঙ্খ্যদর্শনে এবং অন্যান্য দর্শনে করা হইয়াছে বলিলে দোষ হয় না। উপনিষদ্‌কেই ষড়্-দর্শনের সূতিকাগৃহ বলিতে পারা যায়। তন্ত্রশাস্ত্র, মহর্ষি কপিলের প্রকৃতি-পুরুষ-ঘটিত সিদ্ধান্তটিকে স্তন্য দিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন, বলিতেও বাধা নাই; তথাপি ইহা

স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহর্ষি কপিলের ব্যাখ্যা-মূলক প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগে বিশ্বসৃষ্টির কথাটি বহুলোকে যেরূপ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য কোন শাস্ত্রোক্ত কোন নির্দ্দেশ অথবা অপর পাঁচ দর্শনের কোন সিদ্ধান্তই সেভাবে জন সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে,—সমগ্র জীব-জগতে, এমন কি উদ্ভিদ্ জগতেও স্ত্রী-পুং-সংযোগে জীবদেহের এবং উদ্ভিদাদি-দেহের উৎপত্তি সংঘটন হইতেছে, ইহা আমরা সকলেই প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। নিত্য প্রত্যক্ষীভূত স্থূল জগতের এই স্থূল নজির ধরিয়া বিশ্বের উৎপত্তিতেও স্ত্রী ও পুরুষ দ্বিবিধ শক্তির সংযোগের যে একান্ত প্রয়োজন, একথা কেহ বলিলে, তাঁহার কথা আমরা সহজে গ্রহণ করিতে পারি। "এই পরিদৃশ্যমান জগৎসংসার সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমরাও মিথ্যা, আমরা নাই, কেবল একমাত্র পরমাত্মা সত্য এবং একমাত্র পরমাত্মাই আছেন," বেদান্ত-দর্শনের এবম্বিধ উক্তি, সাধারণে পরিগ্রহণ করা দূরে থাকুক, চিন্তাতেও আনিতে পারে না। ন্যায় ও বৈশেষিক-দর্শনের জটিল সিদ্ধান্ত সকল, অতিশয় সূক্ষ্মবুদ্ধি মানবও সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন না। এজন্যই মহর্ষি কপিলের দ্বারা ব্যাখ্যাত, সাঙ্খ্য দর্শনোক্ত স্থূল জগৎসৃষ্টির এবং জীব-প্রবাহের উৎপত্তিবিষয়ক কথাগুলি এ দেশের জনসাধারণে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়াছে। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-

পুরুষ-ঘটিত তত্ত্ব বিভিন্ন মূর্ত্তিতে হইলেও,—কতক উপনিষদ্ মার্গে, কতক তন্ত্র-শাস্ত্র-পথে, কতক জৈনধর্ম্মের দিক্ দিয়া, কতক বৌদ্ধধর্ম্মের দিক দিয়া, এবং কতক ইয়োরোপের প্রসিদ্ধ দার্শনিক অগস্তকোমতের প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তকে (Positive Philosophy of Auguste Comte.) সম্মুখীন করিয়া কেবল এদেশে নহে, আজি ইয়োরোপ, এসিয়া এবং আমেরিকার বিদ্বজ্জন-সমাজে সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল স্থানের মানবমণ্ডলীর মধ্যে প্রায় কেহই হয়ত' মহর্ষি কপিলের নামটি পর্য্যন্ত কখন কর্ণে শ্রবণ করেন নাই এবং হয়ত' প্রকৃতি-পুরুষ-শব্দও তাঁহাদের মধ্যে কখনও কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই, কিন্তু এই মহর্ষির আলোচিত দার্শনিক তত্ত্বটি কোন না কোনও প্রণালীতে তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের ভাষার শব্দে এবং নিজ নিজ অবস্থোপযোগী ভাবের মূর্ত্তিতে রচিত হইয়া ঐ সকল স্থানের জনসাধারণ কর্ত্তৃক যে প্রপূজিত হইতেছে, ইহা আমরা বেশ পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইতেছি। ইহা আধুনিক কালের ঘটনা নহে; বহুশত বর্ষ হইতে এই অবস্থা ঘটিয়া আসিতেছে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা আমাদের উদ্ভট কল্পনা-মূলক কথা নহে, ঐতিহাসিক সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তি-ভূমির উপর উহার প্রত্যেকটি অক্ষর গ্রথিত রহিয়াছে, ইহাই দেখাইবার জন্য এখন ইতিহাস-মূলক দুই একটি

বিষয়ের এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। মহর্ষি কপিলের সাঙ্খ্যদর্শন-বর্ণিত "প্রকৃতি-পুরুষ" আর তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত "শিব-শক্তি" এ উভয়ই যে ফলিতার্থে একই ভাবকে বিকাশ করে, একথা এদেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রায় সকলেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন। তন্ত্রশাস্ত্র স্বয়ং এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন *। প্রকৃতি-পুরুষ বা শিবশক্তি ভাববোধক শিবলিঙ্গপূজা-পদ্ধতি এদেশে কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। রামায়ণে, মহাভারতে এবং প্রায় সমস্ত পুরাণে, শিবলিঙ্গ-পূজার বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ, প্রাচীন ইজীপ্ট দেশের প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি সকলের মধ্যে শিবলিঙ্গ-পূজার চিত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—ইজীপ্টেও অতি পুরাকালে শিবলিঙ্গ-পূজা প্রচলিত ছিল †।

* "শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টি-কল্পনা।"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র।)

"যোনিশ্চ জনিকা মাতা লিঙ্গশ্চ জনকঃ পিতা।
মাতৃভাবং পিতৃভাবং উভয়োরপি চিন্তয়েৎ॥
লিঙ্গরূপো মহাকালো যোনিরূপা চ কালিকা।
তয়োর্যোগপরা ধন্যা তয়োর্যোগপরো মম॥"
(শক্তিসাধন তন্ত্র।)

† "In Egypt, nevertheless, and all over Asia, the mystic and symbolical worship appears

শিবশক্তি-সংযুক্ত বিশ্বসৃষ্টি-ক্রিয়া-ভাবাত্মক এইরূপ চিহ্নকে ঐতিহাসিকেরা "Phallic" Symbol আখ্যা দিয়া থাকেন। সৃষ্টি-তত্ত্ব-বোধক চিহ্ন বা লিঙ্গ (Phallic Symbol) ইজিপ্টের পিরামিডের চিত্রাবলি মধ্যেই যে কেবল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই নহে; মধ্য এসিয়ার প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নস্তূপ-মধ্যেও এইরূপ লিঙ্গ, প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিব্বতে, চীনে, তাতারে এবং সাইবেরিয়াতে "মহাকাল" উল্লেখে ত' শিবলিঙ্গ অদ্যাপি তদ্দেশীয় বৌদ্ধগণ দ্বারা পূজিতই হইতেছেন, অনেক স্থানে ইউরোপের অনেক পুরাতন খৃষ্ট-উপাসনা-মন্দিরে, (চার্চ্চে) এখনও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। থিওসফিকাল্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ম্যাডাম্ ব্লাভাটস্কি ইয়োরোপ-পরিভ্রমণ সময়ে, স্বয়ং এইরূপ অপূজিত প্রস্তরময়

---

to have been of immemorial antiquity. * * * Diodorus Siculus however, who lived in a more Communicative age, informs us that it signified the Generative attribute. * * * It was the same, in emblematical writing, as the Orphic epithet, Pan-Genetor, Universal generator, in which sence it is stiil worshiped by the Hindus. It has also been observed among the idols of the native Americans."

(ANCIENT ART AND MYTHOLOGY)

শিবলিঙ্গ সকল অনেক পুরাতন চার্চ্চ-মধ্যে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়ে বিমোহিত হইয়া, তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ ISIS UNVELLED গ্রন্থের একস্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছেন *। এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা অনায়াসেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে,—তন্ত্রোক্ত শিবশক্তির পূজা বলিয়াই বলা হউক, অথবা সাঙ্খ্যদর্শন-বর্ণিত প্রকৃতি-পুরুষের পূজা বলিয়াই ইহাকে মনে করা হউক, উহা কেবল এদেশেই নহে, পরন্তু পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এক সময়ে অতিমাত্রায় প্রচলিত হইয়া পড়িয়া-

---

* "Moreover, in all Christian churches," particularly in Protestant churches, where they figure most conspicuously, the two tables of stone of the Mosaic Dispensation are placed over the altar side by side, as a united stone, the tops of which are rounded * * * The right stone is *masculine,* The left *faminine.* Therefore neither Catholics nor Piotestants have a right to talke of the "indecent forms" of heathen monumentes so long as they ornamant their own churches with the symbols of the *Lingham* and *Yoni*, and even write the Laws of their god upon them."

(ISSI UNVEILED.)

ছিল। এখনও বোধ হয় কোনও না কোনও ভাবে অধিকাংশ মানুষই যে প্রকৃতির উপাসক হইয়া রহিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সাঙ্খ্যদর্শনের সৃষ্টি-তত্ত্ব বা প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব, ধর্ম্ম-সাধনার দিক দিয়া লোকের কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়া রহিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। এতদ্ভিন্ন স্থূল বিজ্ঞানের দিক দিয়া, সাঙ্খ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত ইয়োরোপের বিদ্বজ্জন-সমাজে কি ভাবে আজি সমাদৃত হইতেছে, ইহাও একটি দেখিবার বিষয়। এজন্য এ সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করিব।

ইয়োরোপের আধুনিক স্থূলবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে,—বিশ্বের পরমাণু সমষ্টি আকর্ষণ এবং বিক্ষেপণ (Law of Attraction and Repulsion) দ্বারা একবার একত্রিত একবার পৃথক্‌ভূত হইতেছে। উহার অন্তর্নিহিত আকর্ষণশক্তির প্রভাবে বিশ্বের সৃষ্টি এবং বিক্ষেপণ শক্তির প্রভাবে বিশ্বের ধ্বংস ক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে। সাঙ্খ্যদর্শনের "রাগবিরাগয়োর্যোগঃ. সৃষ্টিঃ" এই সূত্রকে উপরি উক্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মূল বলিয়া ধরিতে বাধা কি? রাগ অর্থে Attraction এবং বিরাগ অর্থে Repulsion শব্দ অনায়াসেই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কিন্তু এখন চিন্তার বিষয় এই হইতেছে যে,—পরমাণুতে এই দ্বিবিধ শক্তি উদ্ভাবিত হয় কি উপায়ে? ইয়োরোপীয়ান্

স্থূলবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন,—"এই দুই শক্তি স্বভাবতই পরমাণুতে রহিয়াছে।" আমরা দেখিতেছি পরমাণু ভিন্ন অন্যতেও এই প্রকারের শক্তি সময়ে সময়ে উদ্ভাসিত হইতেছে এবং তাহার ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। টেলিগ্রাফের কলে, বিদ্যুতে, চক্ষুর নিমেষে একটা শক্তি উদ্ভাবিত হইয়া কাশী হইতে কলিকাতা বা কলিকাতা হইতে লণ্ডনে যাইয়া তাহার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। বৈজ্ঞানিক ভাষাতে বিদ্যুতে Nagative এবং Possitive শক্তি নামক দুইটা শক্তির উদ্ভব হয়। ইহাতেও Attraction এবং Repulsion ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাই। বিদ্যুতের প্রকৃতি আজি পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়ান্ পণ্ডিতেরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। মানুষের অন্তঃকরণের মধ্যেও Attraction এবং Repulsion—আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ শক্তির ক্রিয়া যে সর্ব্বদা হইতেছে তাহারও সুন্দর পরিচয় সদা সর্ব্বদা আমরা দেখিতেছি। স্থূল পরমাণুর অস্তিত্ব এ সকল ক্ষেত্রে আমরা বুঝিতে পারি না। ফলতঃ আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ-শক্তির ক্রিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। উহাকে প্রকৃতি-নিহিত মূল শক্তিরই দ্বিমুখী ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ক্রমে এ তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন, আশা করা যায়। এখন পাশ্চাত্যবিজ্ঞান উহার নিকটবর্ত্তী একটা স্থানে পৌঁছিয়া "Transformation of Energy" নামক কিছুকে

দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উহার মূলে যে তিনটি বিশাল বস্তু বিরাজিত রহিয়াছে তৎপ্রতি তাঁহাদের এখনও দৃষ্টিপাত হয় না। এই তিনের নাম,—(১) সত্ত্বগুণ, (২) রজোগুণ এবং (৩) তমোগুণ। মহর্ষি কপিল জগৎসৃষ্টির মূলে এই তিনটি সামগ্রীকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ইতিপূর্ব্বে সাঙ্খ্য-দর্শনের যে একটি সূত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেই পাঠক দেখিয়াছেন—"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অর্থ যে কি, তাহা আজিও ইয়োরোপীয়ান্ বিজ্ঞানবিদ্গণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কথা ত' দূরে থাকুক, সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত উইলসন্ সাহেব, যিনি সাঙ্খ্য কারিকার টীপ্পনীসহ ইংরাজী একখানি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও এই তিনের ইংরাজী অনুবাদ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—(১) Goodness (২) Foulness (৩) Darkness.

সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের প্রকৃতার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, ইয়োরোপীয়ান্ বিজ্ঞানবিদ্গণ এ তত্ত্ব বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে,—বিশ্বে একটিমাত্র গুণ যদি বিরাজিত থাকিত, তাহা হইলে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। গুণ-ঘটিত অবস্থা বৈচিত্র্যেই বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে। সর্ব্বত্র সমান তাপ থাকিলে ঝড়, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি কিছুই হইবার সম্ভাবনা

ছিল না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমসন্ সাহেব, তাঁহার কৃত Natural Philosophy গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন— তাপের কোন কার্য্য পাইতে চাহিলে শীতল ও উষ্ণ আধার দুইই একান্ত আবশ্যক *। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুণের তিনটি অবস্থা যে সময়ে ফুটিয়া উঠে,—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সপ্রকাশ হইয়া উঠেন, তখনই সাঙ্খ্য-দর্শনের ভাষাতে প্রকৃতির মহত্তত্ত্ব অবস্থা বা সৃষ্টির প্রথমাবস্থা সমুৎপন্ন হয়। সৃষ্টিব জন্য গুণ-বৈষম্য যে একান্ত প্রয়োজন একথা, সাঙ্খ্য-দার্শনিক-দিগের ন্যায়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

সাঙ্খ্যদর্শনের বর্ণিত এক একটি বিষয় ধরিয়া, তাহার সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের সিদ্ধান্তের কোন্ অংশে কতখানি সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা এইভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিলে, একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়িবে। এ প্রস্তাবে, এ বিষয়ে সে পরিমাণ স্থান নিয়োগ করিতে আমরা অসমর্থ। কাজেই, এখানে এইমাত্র বলিয়া নিরস্ত হইতে হইতেছে,—ইয়োরোপের বর্ত্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ

---

* "To obtain work from heat we must have hotter and colder bodies, to correspond as it were, with the boilor and condenser of a heat engine." (Natural Philosophy.

দার্শনিক এবং চিন্তাশীল গ্রন্থকার হারবার্ট স্পেন্‌সরের মুখ-নিঃসৃত, পরমা শক্তির স্তুতি মূলক উক্তি, আজি সে দেশের অনেক অনীশ্বরবাদী বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। হারবার্ট স্পেন্‌সরের এতদ্‌সম্বন্ধীয় উক্তিটির স্থূলমর্ম্ম এই,—"এই যে রহস্য, ইহা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা যতই করা হয়, ততই ইহা আরও রহস্যময় হইয়া উঠে, তথাপি এখানে দাঁড়াইয়া এই মহাসত্যটি অনায়াসে ঘোষণা করিতে পারি যে, আমরা আজি এমন একটি অসীম ও অনন্ত শক্তির সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছি, যাঁহার সত্তা হইতে সমস্ত জগৎসংসার নিক্রান্ত হইতেছে *।

হারবার্ট্ স্পেন্‌সরের মুখে এইরূপ উক্তি শুনিয়া আমরা আনন্দিত না হইয়া পারি না, কিন্তু যখন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত প্রকৃতি দেবীর স্তুতিবাক্য আমাদের স্মরণপথে উদিত হয়, তখন তাহার অত্যুচ্চ

---

* "But amid the mysteries which become the more mysterious the more they are thought about, their will remain one *absolute* certainty, that (we are) ever in presence of an Infinite and Eternal Energy from which all things proceed."

RELIGIOUS RETROSPECT & PROSPECT.

ভাবের তুলনায় স্পেন্সরের উপরি লিখিত কথাগুলি কিছুই নহে বলিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে ইচ্ছা হয়; শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত প্রকৃতি দেবীর সুদীর্ঘ স্তোত্র হইতে কয়েক পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি—

"ত্বমেব সর্ব্বজননী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
ত্বমেবাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ স্বেচ্ছয়া ত্রিগুণাত্মিকা॥
কার্য্যার্থে সগুণা ত্বঞ্চ বস্তুতো নির্গুণা স্বয়ং।
পরব্রহ্ম-স্বরূপা ত্বং সত্যা নিত্যা সনাতনী।
তেজস্বরূপা পরমা ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহা।
সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বেশা, সর্ব্বাধারা পরাৎপরা।
সর্ব্ববীজ-স্বরূপা ত্বং সর্ব্বপূজ্যা নিরাশ্রয়া।
সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বতোভদ্রা সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গলা॥
সর্ব্ববুদ্ধি-স্বরূপা চ সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানপ্রদা দেবী সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বভাবিনী॥"

ইয়োরোপের হারবার্ট্ স্পেন্সর্, ENERGYকে অচৈতন্য-রূপা জড়শক্তির অধিক উপরে দেখিতে সমর্থ হয়েন নাই, আর ভারতের শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে চৈতন্য-রূপা সুখ-দুঃখ-বোধযুক্তা এবং অনুগ্রহ-বিতরণ-পরায়ণা পরমা শক্তিরূপে দেখিতে সমর্থ বলিয়াই এ দুইএর মুখনিঃসৃত উক্তির সুরের, ভাবের ও রসের এত বিশাল পার্থক্য আমরা দেখিতে পাইতেছি।

ইহার উপরে আরও একটু বলিবার ও শুনিবার কথা আছে। এখানে প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমময়ী পরমা শক্তি

প্রকৃতি দেবীকে সম্বোধন করিয়া যেরূপ মধুময় ভাষাতে স্তুতি করিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-লেখক দেখাইয়াছেন। মহাভারতে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার ভিতরে তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ, এই প্রকৃতি দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া আর এক অপূর্ব্ব স্বরে গীত গাহিয়াছেন।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই,—অহঙ্কারে অন্ধ আত্মা, আপনাকেই কার্য্যের কর্ত্তা মনে করে; বস্তুত জগৎ-সংসারের সর্ব্ববিধ কার্য্যের মূলকর্ত্তা হইতেছেন—প্রকৃতি। প্রকৃতি নিজগুণ দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। অতঃপর ব্রহ্মভাবে ভাবান্বিত হইয়া অর্জ্জুনকে, নিজের হৃদয়ের ভিতরের বিভূতি দেখাইতে দেখাইতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ফেলিলেন—

"অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।"

অর্থাৎ জগতের মধ্যে যত কিছু শ্রেষ্ঠবস্তু দেখিতেছ, সমস্তই আমি। আমিই বৃক্ষকুলশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থ, আমিই দেবর্ষিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ; গন্ধর্ব্বগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে চিত্ররথ, সেও আমিই, আর সিদ্ধ-পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে কপিল মুনি, সেও আমি।

সাঙ্খ্যদর্শনপ্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল মুনির সম্বন্ধে এরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ উচ্চভাবের কথা নররূপধারী

নারায়ণের মুখে উচ্চারিত হইবার পরেও ইদানীন্তন কালের যেসকল ব্যক্তি মহর্ষি কপিলকে নিরীশ্বরবাদী নাস্তিকাদি বলিয়া কটূক্তি করেন, তাঁহাদের বিচারশক্তি যে নিতান্তই রুগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ফলতঃ মহর্ষি কপিল, সাঙ্খ্যদর্শনে যে ত্রিগুণাদির কথা সংক্ষেপে উত্থাপন করিয়াছেন, বিস্তারিতভাবে সেই সকল গুরুতর কথার আলোচনা লইয়াই গীতার দুইটি অধ্যায়, প্রায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এজন্য, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়কে "সাংখ্যযোগাধ্যায়" বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহাও এস্থলে বক্তব্য যে,—মূল সাঙ্খ্যদর্শনগ্রন্থ এখন অপ্রাপ্য; সাঙ্খ্যপ্রবচন-সূত্র নামে মহর্ষি কপিলের কয়েকটিমাত্র সূত্র একত্রিত করিয়া যে গ্রন্থখানিকে সাঙ্খ্যদর্শন' বলিয়া এখন জন-সাধারণে প্রকাশ করা হইতেছে, উহা যে সম্পূর্ণ গ্রন্থ নহে, তাহা একটু চিত্ত-নিবেশ করিয়া পাঠ করিলেই, সহজে বুঝিতে পারা যায়। সাঙ্খ্যকারিকার উপসংহারের শ্লোকটি পাঠ করিলেও এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু পাওয়া যায়। ঐ শ্লোকটি এই—

"শিষ্যপরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেন চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তং॥
সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদ-বিবর্জ্জিতাশ্চাপি॥"

এই শ্লোক-বর্ণিত "ষষ্টিতন্ত্র" নামে কোন গ্রন্থই অনুসন্ধান করিয়া এখন পাওয়া যায় না। এসিয়াটিক্ সোসাইটির লাইব্রেরীতে এবং মহারাজা কাশ্মীর ও মহারাজা মহীশূরের এবং কাশীর মহারাজার সংস্কৃত পাঠাগারে অনুসন্ধান করিয়াও "ষষ্টিতন্ত্র" নামক কোন গ্রন্থের তথ্য আমরা পাইতে পারি নাই। এই "ষষ্টিতন্ত্র"খানি তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত কোন গ্রন্থ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, কিন্তু উদ্ধৃত শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি করিলে, উহাকে তন্ত্র-শাস্ত্রের গ্রন্থ অপেক্ষা সাঙ্খ্যদর্শনেরই কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্থির করিতে ইচ্ছা হয়। "ষষ্টিতন্ত্র" তন্ত্র-শাস্ত্রের অন্তর্ভূত গ্রন্থই হউক, অথবা সাঙ্খ্যদর্শনের মূলগ্রন্থই হউক, তাহা যখন এখন অপ্রাপ্য, তখন তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

"ষষ্টিতন্ত্র" নামক গ্রন্থ এখন অদৃশ্য হইলেও "মহাকাল সংহিতা" "রুদ্রযামল" "কালকল্প" "কপিল-যোগ" প্রভৃতি তন্ত্রের কোনখানির আংশিক, কোনখানির বা সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উপরি লিখিত গ্রন্থ কয়েকখানিতে, তান্ত্রিক শিবশক্তি-সাধনার কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি-পুরুষ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়, বিশ্বসৃষ্টি-রহস্য, দেব বা প্রেত-অবস্থাপ্রাপ্ত দেহবিচ্যুত জীবাত্মার সহায়তাতে লৌকিক প্রয়োজন সংসাধন ইত্যাদি সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল-যোগদর্শনের আলোচিত এবং তদতিরিক্ত জীবাত্ম-ঘটিত

আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। এজন্য, জীব-তত্ত্বজ্ঞানোৎসুকদিগের পক্ষে, এই সকল অতীব আদরের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। গরুড়-পুরাণে জীবের পারলৌকিক গতি এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধে অনেক জানিবার বিষয় পাওয়া যাইতে পারে। জীবতত্ত্ব বুঝিবার জন্য সাঙ্খ্যদর্শন যিনি পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে উহার সহিত উপরি লিখিত তন্ত্রশাস্ত্রের কয়েকখানি পুথি এবং অবকাশ থাকিলে, গরুড়-পুরাণের প্রেততত্ত্ব-প্রস্তাব পাঠ করিয়া দেখিতে আমরা অনুরোধ করি। যাঁহারা মূল সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ পাঠ করা সুবিধাজনক মনে করেন, তাঁহাদিগকে, সাঙ্খ্যকারিকার কলিব্রুক-কৃত ইংরাজী অনুবাদ এবং মিঃ এইচ, এইচ, উইলসন্-কৃত সাঙ্খ্যকারিকার গৌড়পাদ ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিতে বলিতে পারি।

জীবাত্মা সম্বন্ধে পাঠককে ষড়্‌দর্শনের সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ রসাস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দর্শন হইতে দুই চারিটি কথার সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র উপরে করা হইল। জীবাত্মঘটিত দার্শনিকতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনার স্থান এরূপ ক্ষুদ্র আয়তনের পুস্তিকাতে হইতে পারে না। স্থানের অপ্রতুলতা ভিন্ন আরও একটি প্রধান অসুবিধার কারণ এই হইয়াছে যে,—বর্ত্তমান সময়ের ইয়োরোপীয়ান্

দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে পথ ধরিয়া দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই Analytic কিম্বা Posteriari পথ ধরিয়া পূর্ব্বকালের ঋষি-দার্শনিকগণ এদেশে দার্শনিক বিচার করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। জীবাত্মা সম্বন্ধে, বেদবাক্যকেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি কপিলের প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্রে জীবাত্মার অস্তিত্ব-প্রমাণের একটি প্রধান যুক্তি হইতেছে—

"অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্ব-সাধনাভাবাৎ।"

উদ্ধৃত বচনের তাৎপর্য্য এই যে,—আত্মা নাই ইহা যখন কেহ প্রমাণ করিতে পারে না, অতএব স্থির হইল আত্মা আছে। এরূপ যুক্তি দার্শনিক দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট হইলেও সাধারণ পাঠকের রুচিকর হয় না। কাজেই জীবাত্ম-ঘটিত ষড়্‌দর্শনের নির্দ্দেশগুলি অতি সাবধানে মন্থন করিয়া উহার মর্ম্মার্থের সহিত উপনিষৎ, তন্ত্রশাস্ত্র এবং পুরাণাদিতে বর্ণিত বিষয়ের সুরস কিয়ৎ পরিমাণে সংমিশ্রণ করিয়া, উহাকে কিঞ্চিৎ তরল করিয়া লইয়া, প্রশ্নোত্তরের ছাঁচে ঢালিয়া আর একভাবে এক্ষণে পাঠকগণের সম্মুখে আমাদের আলোচিত সিদ্ধান্ত সকল রাখিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছি।

আমাদের এই স্থূলদেহের ভিতরে এমন একটা কিছু বস্তু থাকে, যাহার অভাব হইলে আমাদের দেহের আর সুখ দুঃখ কিছুই অনুভব করিবার ও তাহা অন্যকে

বুঝাইবার শক্তি থাকে না এবং দেহের রক্ষা ও জন্য দেহের অনুকূল বস্তু দেহে আহরণ করিয়া লইবারও ক্ষমতা থাকে না এবং পচিয়া নষ্ট হওয়া হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার কোন উপায় থাকে না ; ঐ বস্তু কি ? ঐ বস্তুকেই কেহ জীব, কেহ আত্মা, কেহ পুরুষ, কেহ মায়া-আবরিত পরমাত্মা বা তাহার ছায়া, কেহ "কর্ম্মগ্রন্থি" বা ঐরূপ একটা কিছু নাম দিয়া রাখিয়াছেন। উহা দেহেতে থাকা সময়ে এবং সে সময়ে চৈতন্য থাকিলে, উহা নিজেই উহার অস্তিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আমরা চক্ষু দ্বারা উহাকে দেখিতে না পারিলেও উহার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হইতে পারে না। আমি আমার যে চক্ষু দিয়া জগৎ দেখিতেছি, সেই চক্ষুটিকে নিজে কখনই দেখি নাই ; এজন্য আমার চক্ষু নাই, এ সিদ্ধান্ত কখনও করি না। যাহা দেহে থাকিলে আমরা বাঁচিয়া থাকি, তাহারই নাম মহর্ষি কপিল রাখিয়াছেন—"পুরুষ"।

দেহ আছে এবং দেহে আত্মা আছে অর্থাৎ আমি জীবিত আছি, কিন্তু সেরূপ অবস্থাতেও দেহের সুখ দুঃখ বোধ করিবার ক্ষমতা নাই, এমন অবস্থাও অনেক সময় উপস্থিত হয়। যাহা থাকাতে সুখ-দুঃখ-বোধ করিবার সামর্থ্য থাকে, যাহার অভাবে জীবিত থাকা অবস্থাতেও সুখ-দুঃখ-বোধের সামর্থ্য থাকে না ; সেই বস্তুটি কি ? সেই বস্তুরই নাম রাখা হইয়াছে—চৈতন্য। দেহ আছে, কিন্তু

সুখ-দুঃখ-বোধ নাই, চৈতন্য নাই ; আত্মা আছে, তথাপি বোধ শক্তি নাই, তাহা হইলে চৈতন্যকে এ দুইয়ের অতিরিক্ত আর একটা কিছু বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কি? না ; এই দুইএর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া "চেতনা" স্বতন্ত্রভাবে তিষ্ঠিতে পারে না; কাজেই চৈতন্যকে এই দুইএর বাহিরে, তৃতীয় বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে না। যাঁহারা এই পুস্তিকা-লিখিত বিষয়-গুলি মনোযোগের সহিত এ পর্য্যন্ত পড়িয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা জানিয়াছেন—পুরুষ গুণাতীত, পুরুষের সুখ-দুঃখ-বোধ নাই, অতএব বুঝিতে হইবে—চৈতন্য প্রকৃতিরই গুণ। যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়, সুখ-দুঃখ-বোধ শক্তি থাকে, আর মন, বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচার, যাহাকে ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার নাম মহর্ষি কপিল রাখিয়াছেন—"প্রকৃতি"।

প্রকৃতি জড় হইলে জড়কে আশ্রয় করিয়া চৈতন্য থাকিবে কিরূপে? প্রকৃতিকে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া চৈতন্য কিরূপে থাকিতে পারে? উত্তর—প্রকৃতি জড় নহে। দর্শনশাস্ত্রকারেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য এবং মানুষকে বুঝাইবার জন্য, পুরুষ হইতে প্রকৃতিকে ভিন্ন করিয়া একটা পৃথক্ নাম দিয়া রাখিয়াছেন ; বস্তুতঃ পুরুষ হইতে প্রকৃতি অভিন্ন। গুণ পরিমিত অর্থাৎ গুণের পরিমাণ করা সম্ভব, গুণের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে।

গুণান্বিত পুরুষ বলিতে হইলে, পুরুষকে অনন্ত ও অসীম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে না, তাহাতে পুরুষকে খাট করিয়া ফেলা হয়। কাজেই কেহ প্রকৃতিতে চৈতন্য, কেহ পুরুষে চৈতন্য রাখিতে চাহেন। তন্ত্রশাস্ত্রে "শিব-শক্তি অভেদ" বলিয়া এই গোলযোগের সুন্দর সমাধান করা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনমূলেও জড়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, একমাত্র পরমাত্মারই অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে এবং সেই পরমাত্মা যে চৈতন্যময় ইহাও বলা হইয়াছে।

পাহাড়, পর্ব্বত, ইট, কাঠ, পাথরকে কি তবে চেতন বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? যখন বিশ্বসংসারে কিছুই "জড়" নাই, তখন সকলকেই চেতন বস্তু বলিতে হইবে; তবে পাহাড়, পর্ব্বত, ইট, কাঠ, পাথর অস্ফুট-চৈতন্য শ্রেণীভুক্ত, আর জীবিত মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গকে স্ফুট-চৈতন্য শ্রেণীভুক্ত, বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

বেদান্ত-দর্শন যেমন বলেন,—পরমাত্মা ও মায়া ভিন্ন আর কিছুই নাই, সেইরূপ সাঙ্খ্যদর্শন বলেন,—পুরুষ আর প্রকৃতি এই দুই ভিন্ন জগতে তৃতীয় আর কিছুই নিত্য বস্তু নাই *। যাহাকে পুরুষ বলা যাইতে পারে না, তাহাকেই প্রকৃতি বলিতে হইবে। অথবা যাহাকে প্রকৃতি বলা যাইতে

---

* "প্রকৃতি-পুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্।"

পারে না, তাহাকেই পুরুষ বলিতে হইবে। পুরুষ গুণাতীত আর পাহাড়, পর্ব্বত, কাঠ, পাথর, জল, জঙ্গল, সমস্তই ত্রিগুণাত্মক, কাজেই এ সমস্তকেই যখন প্রকৃতি বলিতে হইতেছে, আর প্রকৃতিকেই যখন চৈতন্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তখন এই দৃষ্টিতে, বিশেষতঃ বেদান্ত ও তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে চৈতন্য-বিহীন জড় বলিয়া কিছু নাই। কাজেই স্ফুট-চৈতন্য এবং অস্ফুট-চৈতন্য এই দুই শ্রেণীতে সমস্তকে স্বীকার করিয়া লওয়া ভিন্ন আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। পাহাড়, পর্ব্বত, কাঠ, পাথর, জল, জঙ্গল, ধূলি, মাটি প্রভৃতিকে অস্ফুট-চৈতন্য শ্রেণীভুক্ত বস্তু; আর বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, নর, নারী অপ্সরা, কিন্নরী দেব, দেবী প্রভৃতিকে স্ফুট-চৈতন্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়া আমরা স্থির করিয়া লইতে পারি। বৃক্ষলতাতে চৈতন্যের কিঞ্চিৎমাত্র বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মুনি, ঋষি, দেব, দেবীতে চৈতন্য অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

আরও একটু কথা এখানে আলোচনা করিতে বাধা নাই। সংস্কৃত ভাষাতে একই শব্দ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিবার বহুল ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্থলে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে এবং দশম অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকে লিখিত "ব্যবসায়" শব্দের উল্লেখ করিতে পারা যায়। সেইরূপ এই "চৈতন্য" শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে যে ব্যবহার করা

হইয়াছে, তাহাও আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। কোনও স্থানে আত্মার বা জীবের অস্তিত্ব-বোধক প্রতিশব্দ রূপে "চৈতন্য" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে চৈতন্য বলিতে আমাদিগকে যাহা বুঝিতে হইবে, আর যেখানে সুখ-দুঃখ অনুভবের কারণ স্বরূপ বোধ-শক্তি-জ্ঞাপক "চৈতন্য" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, সেখানে তৎপরিবর্ত্তে অন্যরূপে উহার অর্থ আমাদিগকে পরিগ্রহণ করিতে হইবে। সম্ভবতঃ চৈতন্য শব্দের এই দ্বিবিধ অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই মহর্ষি কপিল, তাঁহার সাঙ্খ্যদর্শনের এক সূত্রে পুরুষে চৈতন্য-গুণ থাকিতে পারে না এবং আর এক সূত্রে পুরুষকে চৈতন্যময় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অথবা লয়কালে চৈতন্যাতীত, আর সৃষ্টি-কালে চৈতন্যযুক্ত জানিয়াও হয়ত' পুরুষকে ঐ ভাবে মহর্ষি কপিল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুইয়ের কাহাকেও চৈতন্য-বিহীন বলিয়া যে, সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না, ইহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই সহজে প্রতীয়মান হইতে পারে। একটি বৃক্ষের বীজে উহার জীবনী শক্তি নিদ্রিতাবস্থার ন্যায় অকর্ম্মণ্য অবস্থায় বহুকাল ব্যাপিয়া নিহিত থাকে, ক্ষেত্র, জল এবং বায়ুতে ঐ বীজ সংযুক্ত হইলে উহার সজীবতা জাগ্রত বা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহা দেখিয়া যেমন বৃক্ষের সজীবতার কারণ—বীজ এবং ক্ষেত্র উভয়কেই স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ পুরুষ এবং প্রকৃতির সম্মেলনেই জীবের জীবনী শক্তির বিকাশ এবং চৈতন্যের পরিস্ফুটন সম্পন্ন হইয়া থাকে, মনে করা যাইতে পারে।

আর একটি বিষয় ধরিয়া এক্ষেত্রে আমরা আরও একটু বিচার করিতে পারি;—পরিদৃশ্যমান জগতে কেবল সম অবস্থাপন্ন দুইটি বস্তু হইতে তৃতীয়ের উৎপত্তি আমরা দেখিতে পাই। পুং-জীব ও স্ত্রী-জীবের সম্মেলনে জীবোৎপত্তি এবং পুংবৃক্ষ ও স্ত্রীবৃক্ষের সম্মেলনে বৃক্ষবীজোৎপত্তির সংঘটন হয়। এই প্রাকৃতিক তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া আমরা অনায়াসেই ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে,—পুরুষ চেতন এবং প্রকৃতি জড় হইলে, অথবা প্রকৃতি চেতন ও পুরুষ জড় হইলে এই সচেতন বিশ্বসৃষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইতে পারিত না—অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েতেই চৈতন্য নিহিত আছে বলিয়াই সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে।

কেবল চৈতন্য-শক্তি বলিয়া নহে, বেদ ও উপনিষদে পরমাত্মার প্রতি চৈতন্যময়, আনন্দময়, শাশ্বত প্রভৃতি যত কিছু গুণবাচক শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, সে সমস্তই প্রকৃতিতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা প্রবন্ধ লেখকের স্ব-কপোল-কল্পিত সিদ্ধান্ত নহে,—তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপই সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকৃতিকে চিন্ময়ী, আনন্দময়ী, জ্ঞানময়ী, নিত্যা প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গুণাতীত পরমাত্মাতে এই সকল গুণের আরোপ, দার্শনিক দৃষ্টিতে ভাল না লাগিলেও বেদ, উপনিষৎ, তন্ত্র, পুরাণ, ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ নিঃসঙ্কোচে যখন ইহা স্বীকার করিয়াছেন, তখন ইহাকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

অগ্নিতে প্রকাশ-গুণ আছে। অগ্নিতে তেজ আছে। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে। এই অগ্নির যে ভাব, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে আমরা ঐ সকল গুণের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই না। কিন্তু অগ্নির স্থূল মূর্ত্তিতে আমরা ঐ সকল দেখিতে পাই। প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধেও আমরা কতকটা এইভাবে চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করিয়া লইতে পারি। বীজ-ভাবে পুরুষ যে সময় বিরাজিত, তখনই পুরুষ গুণাতীত, অর্থাৎ তখন তাহাতে চৈতন্য, আনন্দ, জ্ঞান প্রভৃতি কোনরূপ গুণবাচক শব্দেরই আরোপ হইতে পারে না; কিন্তু সেই বীজবৎ পুরুষ কিম্বা জ্যামিতির আকার-শূন্য বিন্দুবৎ পুরুষ যে সময় প্রকৃতিতে আলিঙ্গিত বা বিজড়িত হইয়া সৃষ্টি প্রবাহের উদ্ভাবক হইয়াছেন, এই সময়ে তাঁহাকে চৈতন্যময়, আনন্দময় প্রভৃতি বহুবিধ বিশেষণে বিভূষিত করা যাইতে পারে,—এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে তাহাই করা হইয়াছে।

আর একটা চিন্তাধারা ধরিয়া এই দুরারোহ ক্ষেত্রে আমরা আর একটু অগ্রসর হইতে পারি। সুপ্রশস্ত নদীর এক পারে দাঁড়াইয়া, নিজের কোন সঙ্গীকে, পরপারের নিবিড় বনাবৃত অর্দ্ধলুক্কায়িত কোন দেব-মন্দিরের চূড়া কিম্বা কোন একটি গ্রাম দেখাইবার সময়ে নিকটবর্ত্তী কোন উচ্চ তালবৃক্ষ বা অশ্বত্থ বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া প্রথমে দেখাইবার রীতি আছে। তৎপরে ঐ বৃক্ষের সন্নিকটস্থ

আর একটা বৃক্ষ দেখাইয়া তাহার এদিকে বা ওদিকে বলিয়া ক্রমে ঐ গ্রামের বা দেব-মন্দিরের মূলস্থান নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। আকাশে ধ্রুবতারা নির্দ্দেশ করিবার সময়ে প্রথমে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখান হয়। তৎপরে তাহার পার্শ্বস্থিত আর একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে লক্ষ্য করিতে বলা হয়। এইভাবে ক্রমে দর্শকের দৃষ্টিকে ধ্রুবতারার সন্নিকটে আনিতে চেষ্টা করা হয়। অবশেষে ধ্রুবতারার সহিত দর্শকের পরিচয় করিয়া দেওয়া হয়। কতকটা এই-ভাবে অনাদি, অনন্ত, অসীম ও অবোধ্য পরমাত্মাকে আমাদের অধ্যাত্ম-দৃষ্টিপথে আনিবার সুবিধা বিধানার্থে অনাদি, অনন্ত, অসীম ভাবাপন্ন আর দুই চারিটা বস্তুর সহিত ধীরে ধীরে প্রথমতঃ আমাদের পরিচয় করিয়া দিতে হয়। ঋষিগণ হয় ত' ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছেন। গুণাতীত পরমাত্মার প্রতি চৈতন্যময়, জ্ঞানময়, আনন্দময় প্রভৃতি গুণবাচক শব্দের আরোপ এ কারণেও সম্ভব হইতে পারে। গৃহ-প্রাঙ্গণে নিপতিত সূর্য্যের কিরণকে আশ্রয় করিয়া যেমন আমরা ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া সূর্য্যমণ্ডলের জ্ঞান আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করি, আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির অন্তর্ভূত আকাশের এক কণিকামাত্র নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া যেমন আমরা অসীম, অনন্ত আকাশকে ধারণা করিতে প্রয়াস পাই, সেইরূপ "আনন্দময়" "চৈতন্যময়" প্রভৃতি শব্দাদিকে ধরিয়া আমরা গুণাতীত

পরমাত্মার অসীমভাব কিয়ৎ পরিমাণে হৃদ্বোধ করিতে চেষ্টা করিতে পারি। এই চেষ্টার সহায়ক যতগুলি বিরাটভাবাত্মক শব্দ ঋষিগণ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্যে "কাল"কেই আমরা প্রথম স্থান দিতে পারি।

কালের আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। কালের ঊর্দ্ধদিক্ নাই, কালের অধোদিক্ নাই। কালের দৈর্ঘ্য নাই, প্রস্থ নাই, আকার নাই, বিকার নাই, অথচ কাল সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কালের রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, কোমলতা কাঠিন্য নাই। কোন বিশেষ স্থানকে আশ্রয় করিয়া কালের স্থিতি নাই, কালের গতি নাই। কালের সৃষ্টি নাই, কালের ধ্বংস নাই। কাল উষ্ণ নহে, কাল শীতলও নহে। কাল জ্যোতির্ম্ময় নহে, কাল অন্ধকারও নহে। কালের জাগ্রতাবস্থাও নাই, কালের নিদ্রিতাবস্থাও নাই। কালকে চেতন বস্তু বলিতেও বাধা নাই, কালকে অচেতন বস্তু বলিলেও সে কথার প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। কালের নিজের ক্রিয়াশক্তি নাই, কিন্তু বিশ্বসংসারের যে কোন স্থানের যত কিছু কার্য্য তৎসমস্ত এই কালের আশ্রয়েই সর্ব্বদা সম্পন্ন হয়। কাল সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কাল সম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা কথিত হইল, ইহার প্রত্যেক কথাটিই পরমাত্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ-রূপে খাটিতে পারে। পরমাত্মারও আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। পরমাত্মার ঊর্দ্ধদিক্ বা অধোদিক্ নাই।

পরমাত্মার দৈর্ঘ্য নাই, প্রস্থ নাই, আকার নাই, বিকার নাই, অথচ পরমাত্মা সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। পরমাত্মার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, কোমলতা নাই, কাঠিন্য নাই। কোনও স্থান বিশেষকে আশ্রয় করিয়া পরমাত্মার স্থিতি নাই। পরমাত্মার গতাগতিও নাই। পরমাত্মার সৃষ্টি নাই, ধ্বংসও নাই। পরমাত্মার জাগ্রতাবস্থাও নাই, পরমাত্মার নিদ্রিতাবস্থাও নাই। কালের ন্যায়, পরমাত্মারও নিজের কোনরূপ কার্য্যকরণ-শক্তি নাই অথচ বিশ্বসংসারের যে কোন স্থানে যতকিছু কার্য্য সংঘটন হয়, তৎসমস্তের মূলপ্রযোজিকা শক্তি, পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে, বলা যাইতে পারে। ফলতঃ কাল সম্বন্ধে এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে আমাদের এদেশের প্রাচীন ঋষিগণের উক্তি সকল এতই ঘনিষ্ঠভাবে এবং সমসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে যে, ইঁহাদের একবে অন্য হইতে পৃথক করিয়া লইয়া বুঝিতে চাহিলে, পার্থক্য-রেখা কোথায় টানিতে হইবে, স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই কঠিন অবস্থাতে আসিয়া পড়িতে হয়। অনেকে পরমাত্মা ও মহাকাল—এক এবং অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া এ কঠিন সমস্যার সমাধান করিয়া থাকেন। তন্ত্র-শাস্ত্র এইরূপ সমাধানেরই সহায়তা করে। চীন ও তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধকগণ এবং এদেশের জৈন-দার্শনিকগণ মহাকালকেই সর্ব্বোচ্চ উপাস্যের স্থানে

বসাইয়া হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মমত-ঘটিত বিরোধের কারণ অনেকটা বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আত্মতত্ত্ববিৎ ঋষিগণ, তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে, বৌদ্ধ ও জৈন-দার্শনিক পণ্ডিতগণের ন্যায় যদিও মহাকালকে মানবের সর্ব্বোচ্চ উপাস্য বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহসী হয়েন নাই, কিন্তু মহাকাল যে পরমাত্মা বা পরমেশ্বরেরই ভাব-বিশেষ বা তেজ বিশেষ এরূপ উক্তি অনেক স্থানেই তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন *। পুরাণে এরূপ বাক্যও দেখিতে পাওয়া যায় যে,—পুরুষের (শিবের) অপ্রতিহত তেজ, কালে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; এই হেতুতেই কালের এতাদৃশ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়। সাঙ্খ্যদর্শনের দৃষ্টিতে পুরুষে "তেজঃ" বলিয়া কোন বস্তু নাই এবং কালেরও নিজের কর্ম্মশক্তি বা তেজ নাই। মহর্ষি কপিল, সমস্ত

---

* "কলা-কাষ্ঠা-নিমেষাদি কলা-কলিত-বিগ্রহম্।
কালাত্মেতি সমাখ্যাতং তেজো মাহেশ্বরং পরম্॥

* * *

তস্মাৎ কালবশে বিশ্বং ন স বিশ্ববশে স্থিতঃ।
শিবস্য তু বশে কালো ন কালস্য বশে শিবঃ॥
যতোঽপ্রতিহতং শার্ব্বং তেজঃ কালে প্রতিষ্ঠিতম্।
মহতী তেন কালস্য মর্য্যাদা হি দুরত্যয়া॥"

(শিবপুরাণ।

কর্ম্মশক্তিই প্রকৃতিতে ন্যস্ত দেখিয়াছেন। প্রকৃতির পরা শক্তি মহাকালে প্রতিফলিত হইয়াই হউক বা পুরুষ (শিব) হইতে উহাতে সংক্রমিত হইয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, মহাকাল যে জগতের সৃষ্টি, সংহার ও পালন-ব্যাপারে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া রহিয়াছেন,—একথা পুরাণের অনেক স্থানে পুনঃ পুনঃ বিঘোষিত হইয়াছে *।

এই কালকে আশ্রয় করিয়া আমরা পরমাত্মার অস্তিত্ব কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারি? এখন তাহাই বলিতেছি। কাল,—ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহার অস্তিত্ব আদৌ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, অথচ কাল বলিয়া যে একটা বস্তু আছে একথা আমরা অস্বীকার করিতেও পারি না। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যেই কালের অস্তিত্ব আমাদিগকে স্বীকার

---

* "কালাদুৎপদ্যতে সর্ব্বং কালাদেব বিপদ্যতে।
ন কাল-নিরপেক্ষং হি ক্বচিৎ কিঞ্চন বিদ্যতে॥
যদান্তান্তর্গতং বিশ্বং শশ্বৎ সংসার-মণ্ডলম্।
স্বর্গ-সংহৃতি মুদ্রাভ্যাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥
ব্রহ্মা হরিশ্চ রুদ্রশ্চ তথান্যে চ সুরাসুরাঃ।
যৎকৃতাং নিয়তিং প্রাপ্য প্রভবো নাতিবর্ত্তিতুম্॥
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যাদ্যৈর্বিভজ্য জরয়ন্ প্রজাঃ॥" ইত্যাদি
(শিবপুরাণ।)

করিয়া চলিতে হয় এবং কাল মানিয়া কথা বলিতে হয়। পরমাত্মা আর মহাকাল যে কতকটা সমভাবাপন্ন ইহাও ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। ঐরূপ আদি-অন্ত-বিহীন বিশাল মহাকাল বলিয়া যদি একটা বস্তু থাকিতে পারে, তবে প্রায় ঐ ভাবেরই আদি-অন্ত-শূন্য আর একটা বিরাট বস্তু যে পরমাত্মা, তাহাই বা থাকিতে না পারিবে কেন? এইরূপ চিন্তার সূত্র ধরিয়া কালের অস্তিত্ব মানিবার সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার অস্তিত্ব মানিয়া লইবারও একটা বিশেষ সুবিধা আমরা পাইতে পারি। পরমাত্মার অস্তিত্ব মানিয়া লইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার পক্ষেও আর বিশেষ কোন বাধা প্রতিবন্ধক থাকে না। পরমাত্মা এবং জীবাত্মা বা সাংখ্যদার্শনিকদের বিরাট্ পুরুষ এবং জীবদেহে সংস্থিত পুরুষের মধ্যে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই,—উভয়েই যে এক, অন্ততঃ সমভাবাপন্ন, ইহা অনেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলতঃ "মহাকালকে" ধরিয়া "পরমাত্মা" এবং "পরমাত্মাকে" ধরিয়া "জীবাত্মার" অস্তিত্বের সিদ্ধান্তে আমরা আসিয়া অতি সহজেই অবতীর্ণ হইতে পারি। সূর্য্যমণ্ডলের সহিত সূর্য্যতেজের সম্বন্ধের ন্যায় কিম্বা বিশ্বাগ্নির সহিত স্ফুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সম্বন্ধের ন্যায় পরমাত্মাতে ও জীবাত্মাতে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ থাকিলে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে,—পরমাত্মার আদি, অন্ত, সৃষ্টি, সংহার না থাকিলে,

জীবাত্মারও আদি, অন্ত, সৃষ্টি, সংহার নাই অর্থাৎ পরমাত্মাকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে জীবাত্মাকেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্ত্র, পুরাণ এবং প্রাচীন আর্ষদর্শন হইতে আধুনিক জন-বিজ্ঞান যে জীবাত্মাকে একবাক্যে নিত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সেই জীবাত্মা যে নিশ্চয়ই আকাশের ইন্দ্রধনুর ন্যায় কিম্বা কূপের জল-বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণমাত্রস্থায়ী বস্তু নহে, ইহা আমরা অনায়াসেই স্থির করিয়া লইতে পারি। জীবাত্মাকে নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার বর্ত্তমান বাসস্থান একটা দেহের অতিরিক্ত অতীতকালে আরও যে উহার দেহরূপ কতকগুলি বাসস্থান ছিল এবং ইহার পরেও যে উহার আবার কতকগুলি দেহরূপ বাসস্থান প্রাপ্তি ঘটিবে, এবিষয়েও আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি। অতীতের দিকে অনন্তকাল ব্যাপিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য বাসগৃহ এবং ভবিষ্যতের দিকেও অনন্তকাল ব্যাপিয়া ছোট বড় অসংখ্য বাসস্থান যে প্রত্যেকটি জীবাত্মার জন্য ছিল, আছে ও থাকিবে, ইহাও আমরা সহজেই স্থির করিয়া লইতে পারি। দেহই হইতেছে ইঁহাদের এই সকল বাসস্থানের নামান্তর। এখানে "দেহ" অর্থে রক্ত-মাংস-যুক্ত স্থূলদেহ মাত্র বুঝিতে হইবে না; বায়বীয়-দেহ, তৈজস-দেহ, অতি সূক্ষ্ম পরমাণু-বিশিষ্ট দেহ ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থার দেহকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে "দেহ" শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে। দেহশূন্য অর্থাৎ বাস-

গৃহ-শূন্য হইয়া জীবাত্মা এক নিমেষও তিষ্ঠিতে পারেন না। প্রলয়কালের কথা বলিতেছি না, পরন্তু সৃষ্টিকালে কোন না কোনরূপ দেহকে আশ্রয় করিয়া জীবাত্মাকে থাকিতেই হইবে। সৃষ্টিকালে যেমন প্রকৃতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া বিরাট্ পুরুষকে সর্ব্বদা অবস্থান করিতে হয়, সেইরূপ, জীবাত্মাকে বা পুরুষকেও প্রকৃতিরই আর এক মূর্ত্তির অভিব্যক্তি-রূপ দেহের আলিঙ্গনে বিজড়িত হইয়া নানাক্ষেত্রে নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই স্থানে ইয়োরোপীয় স্পিরিচুয়ালিজম্ অনুশীলনকারী পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের একটা ঘোর বিসদৃশ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপীয় স্পিরিট্‌বাদী পণ্ডিতগণ দেহ-বিচ্যুত জীবাত্মাকে কেবল দেহশূন্য স্পিরিট্ বা আত্মা ভাবেই দেখিয়া থাকেন, আমাদের শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত সেরূপ নহে। তাঁহারা বলেন,—স্থূলদেহ-বিচ্যুত জীবাত্মা, স্থূলদেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তন্মুহূর্ত্তেই আর একটা দেহ পরিগ্রহণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রীয় ভাষাতে ইহাকে "আতিবাহিক দেহ" বলা হয়। স্থূলদেহ ত্যাগ আর প্রেতদেহ, দেবদেহ, নরদেহ, পশুদেহ বা যে কোন দেহ পরিগ্রহণের মধ্যবর্ত্তী সময়টা এই আতিবাহিক দেহ ধরিয়া জীবাত্মাকে থাকিতে হয়।

আতিবাহিক দেহ শব্দের অর্থ সাঙ্খ্যদর্শনের টীকাকারগণ যিনি যে ভাবে বুঝিতে এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকুন

না কেন, আমরা উহার সহজ অর্থ এইরূপ স্থির করিয়া লইতে পারি যে,—উহা আমাদের জীবাত্মার ক্ষণকালের ব্যবহার্য্য নৌকা বা গাড়ীস্বরূপ একটা যান-বিশেষ অর্থাৎ আমাদের বাসের অযোগ্য এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে উঠিয়া যাইতে হইলে, আমাদের প্রয়োজনীয় আসবাব লওয়াজীমাগুলি সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য যেমন একখানি গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী কিম্বা নৌকার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আমাদের একটা বাসের অযোগ্য-স্থূল দেহরূপ বাড়ী হইতে অন্য একটা স্থূল-দেহরূপ নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার সময়, সঙ্গের জিনিষপত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য, যাহার আশ্রয় আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহারই নাম রাখা হইয়াছে—আতিবাহিক দেহ। সাংখ্যকারিকার ভাষ্যকার বলেন,—রক্তমাংসময় আমাদের এই স্থূলদেহ-মধ্যে আর একটা সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ থাকে। আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, সেই মৃত্যু দ্বারা রক্তমাংসময় কেবল স্থূলদেহেরই বিনাশ হয়, মৃত্যুতে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহের বিনাশ হয় না। প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ সময়ে আমাদের এই সূক্ষ্মদেহ উৎপন্ন হইয়াছে, আর প্রলয়কালে ইহার লয় হইবে *। আমাদের এই সূক্ষ্মদেহ কি কি উপা-

* "পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি-সূক্ষ্মপর্য্যন্তং।
সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং ॥"
(সাঙ্খ্যকারিকা।)

দানে গঠিত? ইহার উত্তরে সাঙ্খ্যদর্শন বলিতেছেন—অষ্টাদশ তত্ত্বদ্বারা লিঙ্গদেহ সমুৎপন্ন হইয়াছে *। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র; ইহাদের সমষ্টিতে এই সূক্ষ্ম-শরীর গঠিত †। বেদান্তদর্শনমূলক পঞ্চদশীতে অন্নময়-কোষ (স্থূলদেহ) প্রাণময়-কোষ, মনোময়-কোষ, বিজ্ঞানময়-কোষ ও আনন্দময়-কোষ এই পাঁচটা কোষকে আশ্রয় করিয়া আত্মা সংস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। একের মধ্যে অন্য, এইভাবে পরে পরে পাঁচটি কোষ আমাদের দেহের রহিয়াছে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মৃত্যুতে অন্নময়-কোষের কেবল বিনাশ হয়। সে যাহা হউক, এই সকল উক্তি হইতে অন্ততঃ ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে—আমাদের এই স্থূলদেহে সংস্থিত পুরুষ বা জীবাত্মা, আর কতকগুলি বস্তুর সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছেন; মৃত্যুতে স্থূলদেহের বিনাশ হয়, কিন্তু ঐসকলের বিনাশ হয় না। ঐ সকল বস্তু সূক্ষ্মভাবময়, কাজেই ঐগুলিকে সূক্ষ্মদেহের

"প্রলয়ে তন্নাশঃ।" (সাঙ্খ্যপ্রবচন-ভাষ্য।)
"আমহাপ্রলয়াদবতিষ্ঠতে।" (বাচস্পতি মিশ্র।)

* "সপ্তদশৈকং লিঙ্গং"। (সাঙ্খ্যদর্শন।)

† "মহদহঙ্কারৈকাদশেন্দ্রিয়-পঞ্চতন্মাত্রপর্য্যন্তমেষাং সমুদায়ঃ সূক্ষ্মশরীরঃ।" (বাচস্পতি মিশ্র।)

উপাদান বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই আর একভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অর্জ্জুনকে, দেহ-বিচ্যুত জীবাত্মার অবস্থা বুঝাইবার সময়ে বলিয়াছেন—আত্মা এক স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থূল-দেহ পরিগ্রহণ সময়ে বায়ুতে বিজড়িত পুষ্পের গন্ধের মত মন এবং সূক্ষ্ম পঞ্চেন্দ্রিয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া থাকেন *। এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—স্থূল পুষ্প সঙ্গে লইতে অসমর্থ মানুষ, যেমন নিজ অঙ্গে পুষ্পের সুগন্ধ মাখাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সেইরূপ জীবাত্মা তাহার বাসগৃহ স্থূলদেহকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে চলিয়া যাইবার সময়ে কোন স্থূল বস্তুকে সঙ্গে লইয়া যাইতে না পারিলেও, তাহার মনের অতীত জন্মের অর্জ্জিত ভাবগুলিকে সঙ্গে ধরিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। গন্ধ যেমন অশরীরী আকাশে থাকিতে পারে না, কোন না কোন পরমাণু-বিশিষ্ট বস্তুকে ধরিয়া রহে, অর্থাৎ এখানে গন্ধ যেমন অঙ্গ বা বস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ মন, সূক্ষ্মপঞ্চেন্দ্রিয়, অতীত জন্মের সংস্কার এবং কর্ম্মফলাদি

---

* "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।)

জীবাত্মার সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এ সিদ্ধান্তের সারবত্তা আর এক দিক্ দিয়া চিন্তা করিয়াও আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি। পরম পুরুষ বা পরমাত্মা অশরীরী হইয়াও যেমন প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ কাল হইতে চৈতন্যাদি গুণে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছেন এবং পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদিযুক্ত এই বিশ্বসংসার এবং এরূপ শত শত বিশ্বসংসার এখন যেমন তাহার বিরাট্ দেহস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ ক্ষুদ্র পুরুষ অর্থাৎ আমাদের জীবাত্মাও সৃষ্টির আরম্ভ কাল হইতে প্রকৃতি-প্রদত্ত অহঙ্কারাদি গুণযুক্ত সূক্ষ্মদেহে বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে। প্রলয়কালে স্থূল বিশ্ব-সংসাররূপ পরম পুরুষের যেমন বাহ্যিক বিরাট্ দেহের বিলোপ সংঘটন হয়, কতকটা সেইরূপে, আমাদের মৃত্যু বা আমাদের ক্ষুদ্র প্রলয়কালেও, আমাদের এই স্থূলদেহের বিনাশসাধন হয়।

প্রত্যেক প্রলয়ের পরে, নূতন সৃষ্টিকালে, প্রকৃতিদেবী নিজ অঞ্চল হইতে যেমন বাহির করিয়া পরম পুরুষকে আবার একটা নূতন বিরাট্ দেহরূপ নূতন পোষাক উপহার প্রদান করেন, সেইরূপ আমাদের এই স্থূলদেহ-ঘটিত ক্ষুদ্র প্রলয়ের পরে অর্থাৎ আমাদের মৃত্যুর পরে, প্রকৃতিদেবী আবার একটা নূতন দেহ আমাদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া

দিয়া থাকেন। আমাদের সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহটার উপরেই ঐ নূতন দেহরূপ পোষাক আমরা পাইয়া থাকি। প্রলয়কালে, আমাদের ঐ সূক্ষ্মদেহটাও ভাঙ্গিয়া যায়। প্রলয়কালে যেমন এক পরম পুরুষ ভিন্ন তাঁহার চৈতন্যাদি গুণ আর স্বতন্ত্রভাবে কিছুই থাকে না, সেইরূপ প্রলয়কালে আমাদের জীবাত্মার সূক্ষ্ম-শরীরাদিও কিছুই থাকে না, ক্ষুদ্র পুরুষ সকল তখন মহাপুরুষে বিলীন হইয়া একভাবাপন্ন হইয়া রহেন। এবম্বিধ সৃষ্টি ও প্রলয়ধারা অনন্তকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছে। প্রলয়ের সেই মহাবিশ্রাম সময়ে প্রকৃতিও মহাপুরুষ হইতে পৃথক্‌ভাবাপন্ন হইয়া থাকিতে পারেন না। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন,—প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে তৎকালে পুরুষ শায়িত থাকেন। বেদান্ত-দর্শন বলেন,—পরম-পুরুষে বা পরমাত্মাতে সে সময়ে প্রকৃতি বা মায়া বিলীন হইয়া রহেন। ফলিতার্থে, এই দুই উক্তিতে কার্য্যগত বড় বেশী কিছু পার্থক্য নাই। বাবার কোলেই মা থাকুন, অথবা মার কোলেই বাবা থাকুন, মহাকালের বিশ্রামকক্ষে যে পিতামাতা উভয়েই নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে সে সময়ে অবস্থান করেন, ইহা সুনিশ্চিত। মহাকাল স্বয়ং সে সময়ে নিদ্রিত কি জাগ্রত থাকেন তাহা জানিবার উপায় নাই,—তাহা চিন্তা করিবারও আমাদের সামর্থ্য নাই। তত দূরের কথায় প্রয়োজন কি? আমাদের দেহরূপ

বাসগৃহ-বিনাশের পরে আমাদের জীবাত্মা কি অবস্থাতে কোথায় অবস্থিতি করেন, এ গুরুতর বিষয়ের উত্তর দান সমন্বে আর আর দর্শনশাস্ত্রকারগণ যেরূপ নির্ব্বাক্, মহর্ষি-কপিলও তাঁহার সাঙ্খ্যদর্শনের উপসংহারে সেইরূপ কিম্বা ততোধিক মৌনভাবাবলম্বী হইয়া রহিয়াছেন *! "সাঙ্খ্যকারিকা" অতি সংক্ষেপে কেবল এইটুকু বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন,—ধর্ম্ম দ্বারা ঊর্দ্ধগতি এবং অধর্ম্ম দ্বারা অধোগতি হয় †। ধর্ম্ম কি? অধর্ম্ম কি? ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কেন এবং কি ভাবে জীবের ঊর্দ্ধগতি হয় এবং অধর্ম্মাচরণ দ্বারা কেনই বা তাহার অধোগতি প্রাপ্তি হয়, এবং সেই ঊর্দ্ধ ও অধঃস্থানের স্থিতি কোথায়? উহার অবস্থাই বা কি? এ সকল প্রশ্নের উত্তর সাঙ্খ্যদর্শন প্রদান করেন নাই। জীবাত্মার নিত্যত্ব সমাধান করিয়াই সাঙ্খ্যদর্শন নিরস্ত হইয়াছেন; তথাপি সাঙ্খ্যদর্শনের

---

* সাঙ্খ্যকারিকার ইংরাজী অনুবাদক ও টীকাকার মিষ্টার উইলসন্ তাঁহার গ্রন্থের উপসংহারে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া লিখিয়াছেন—" What the condition of pure separated Soul may be in its liberated state, the Sankhya philosophy does not seem to holds necessary to inquire."

† "ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।

(সাঙ্খ্যকারিকা।)

পূর্ব্বাপর সিদ্ধান্ত সকল অনুশীলন করিলে সহজেই বুঝা যায়, জীবের উর্দ্ধ-অধোগতির প্রবর্ত্তক,—জীবের নিজকৃত কর্ম্ম। মানবের অতীত জন্মের কর্ম্ম, ইহ জীবনের কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরজন্মের গতি সমুৎপন্ন করে।

জীবাত্মার স্থূলদেহ ধারণ দ্বারা জন্ম-পরিগ্রহণকেই আমরা উহার তাৎকালিক "ইহকাল" বলিয়া বুঝি। আমাদের ঐরূপ ইহকালের একদিকে,—অতীতের অভিমুখে, যেমন অনন্তকাল পরিব্যাপ্ত হইয়া উহার একটা কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল; অন্যদিকে—উহার মৃত্যুর পরে, অনন্তকাল ব্যাপিয়া তেমনি আবার একটা "পরকাল" নামে সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই কর্ম্মক্ষেত্রে রোপিত বৃক্ষের ফলভোগ হইতে পুরুষ যে সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেন, তখনই তাঁহার মুক্তাবস্থা বলা হয়। এই বিচ্ছিন্নতা সংসাধনের উপায় কি? ষড়্‌দর্শনে বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশিত হইলেও মীমাংসা-দর্শনের চূড়ান্ত মীমাংসা হইতেছে,—বেদ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান। সর্ব্ববিধ কর্ম্মমধ্যে চিন্তাই শ্রেষ্ঠ। স্থূল-পঞ্চভূত-বিজড়িত বিষয়ের চিন্তাতে জীবাত্মার স্থূলের দিকে অর্থাৎ অধোদিকে গতি, আর স্ফুটচৈতন্য অভিমুখী চিন্তাতে জীবাত্মার উর্দ্ধগতি সংঘটন হয়। এই উর্দ্ধাভিমুখী গতিতে আমরা এমন একটা স্থানে যাইয়া পৌছিতে পারি,—

যেখানে পৌঁছিলে আপনা হইতেই পূর্ব্ব-কথিত বিচ্ছিন্নতা সংঘটন হয়। তখন জীবাত্মার মুক্তাবস্থা প্রাপ্তি হয়। এই মুক্তাবস্থাতে তাহার অস্তিত্বের বিনাশ হয় না। এই মহান্‌তত্ত্ব ষড়্‌দর্শন মন্থন করিয়া আমরা নিষ্কাশন করিতে পারি। আমাদিগকে ইহাতেই এখন পরিতুষ্ট থাকিতে হইতেছে। তথাপি পরকালে জীবাত্মার গতি ও স্থিতি সম্বন্ধে আরও কিছু যাঁহাদের জানিবার কৌতূহল আছে, তাঁহারা অষ্টাদশ পুরাণের নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গাধীনে, এতদ্‌ বিষয়ের অনেক কথা দেখিতে পাইবেন। পুরাণ হইতে পরলোকের অবস্থা-ঘটিত সেই সকল উপাদেয় তথ্য সযত্নে সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল।

প্রথমখণ্ড সম্পূর্ণ।

১। পরকালতত্ত্ব (১ম খণ্ড) পড়িয়া আমার মন্তব্য নিম্নে লিখিয়া পাঠাইলাম।

২। যে সংখ্যা "ত্রিশূল" পত্রে আমার জিজ্ঞাস্যের উত্তর প্রকাশ হইবে, ঐ সংখ্যা ত্রিশূল সহ পরকালতত্ত্ব পুস্তকের ২য় খণ্ড নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে ভি, পি, রেজেষ্টারী ডাকে প্রেরণ করিলে বাধিত হইব। (বিনা মূল্যে ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার পুস্তক পাইবার যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা "ভি, পি, রেজেষ্টারী" শব্দ কাটিয়া দিবেন এবং কেবল ডাক-মাশুল পাঠাইবেন।)

নাম..

ঠিকানা..

....

এক আনা ডাক
টিকেট এখানে
আটিয়া ডাকে
দিবেন।

শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার সম্পাদক।

পুস্তক-প্রকাশ বিভাগ।

১ নং পঞ্চক্রোশী রোড্,

নাগোয়া, কাশী।

BENARES. U. P,

ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত

"শ্রাদ্ধতত্ত্ব।"

ইহাতে কি অভিনব বস্তু আছে? এবং কেনই বা ইহা হিন্দু মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে? ইহার "উত্তর বিজ্ঞাপক" স্বরূপ দেশপূজ্য শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলীর শতাধিক পত্র মধ্য হইতে কয়েকখানি পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"এই দুর্দ্দিনে এইরূপ পুস্তকেরই প্রচার একান্ত আবশ্যক। যিনি সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আবাল্য ব্রাহ্মণোচিত সদাচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রাহ্মণ-জাতির আদর্শ হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষ এই গ্রন্থের প্রণয়ন-কর্ত্তা। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বরের বাঙ্গালা ভাষার উপরেও যথেষ্ট প্রভুত্ব আছে। পুস্তকের কোন স্থানেই অস্পষ্ট দোষ হয় নাই, তিনি জলের মত সমস্ত তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি সম্প্রতি অসুস্থ, ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃ-করণে তাঁহার আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"শ্রাদ্ধতত্ত্ব পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। এই তত্ত্বে শাস্ত্রীয়-প্রমাণ-যুক্তি ও লৌকিক-যুক্তি উদ্ভাবিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের আস্তিক্য বুদ্ধি আছে তাঁহারা শাস্ত্রীয়-প্রমাণ-যুক্তির বশবর্ত্তী হইবেন, যাঁহাদিগের আস্তিক্য বুদ্ধি কম তাঁহারাও লৌকিক যুক্তি পরিহার করিতে পারিবেন না। এই পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"শ্রাদ্ধতত্ত্ব নামক সঙ্কলিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। ইহা হইতে সঙ্কলয়িতার অধ্যবসায়ের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পুস্তকখানি বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে সমাজের অনেক উপকার হইতে পারে।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"ধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপ দুই দশ খানা গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরচিত হইলে, এইরূপ হিন্দুধর্ম্মের মহা-প্রলয়ের দিনেও একটু উপকার হয় বলিয়া আমার মনে হয়।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

বিজ্ঞাপন।

"শ্রাদ্ধতত্ত্ব' পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। পুস্তকখানির প্রতি পংক্তিতেই রাজাবাহাদুরের সনাতন ধর্ম্মের প্রতি পর্য্যাপ্ত শ্রদ্ধা প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে অনেক জানিবার ও ভাবিবার বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এজন্য তিনি সনাতন-ধর্ম্ম-বিশ্বাসী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"বর্ত্তমান সময়ে এতাদৃশ গ্রন্থের বাহুল্য এবং বহুল প্রচার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। দুর্বিদ্যা-বিদগ্ধ সন্দিগ্ধচেতা-দিগের শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য লেখক এই গ্রন্থে নানা প্রদেশীয় প্রচলিত প্রথাগুলির উল্লেখ করতঃ বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।"

পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামীজীর পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"आद्योपान्तं पठितवानस्मि श्राद्धतत्त्वाभिधेयं पुस्तकं । पठित्वा चैनत ग्रन्थकर्त्तारं राजाबाहादुरोपाख्यं श्रीमच्छशिशेखरेश्वरं प्रदत्तो मया पुनःपुनः मान्तरिको धन्यवादः । प्रागाविर्भूय श्रीमच्छङ्कराचार्य्येण बौद्धविप्लवात् परित्रात आर्य्य-समाजः, अस्मिन् घोरे समाज-विप्लवकाले तु कदाचार-परिपूर्णास्यास्य आर्य्यसमाजस्य परित्राणाय तस्यैव महात्मनः पुनराविर्भावाशा दुराशैव, अतो वयमिदमेव प्रार्थयामहे श्रीमन्नारायण-समीपे यत्—स्वर्गलोकस्थेन तेन महात्मना प्रदत्तं शुभाशीर्व्वादराशिं विधृत्वा स्वशिरसि वर्द्धितोत्साहोऽयमेव श्रीमान् शशिशेखरेश्वरो भूत्वा द्विगुणित-बलेन स्व-लेखनीं कदाचार-विप्लवात् आर्य्य-समाजस्य परित्राणाय समर्थो भवतु।"

বিজ্ঞাপন।

দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদ পত্র সমূহে প্রকাশিত শ্রাদ্ধতত্ত্বের সুবিস্তৃত সমালোচনা হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

হিন্দুর কাগজ "বঙ্গবাসী"র অভিমত—

"শ্রাদ্ধতত্ত্ব।—হিন্দুমাত্রেরই শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। অনেক হিন্দু শ্রাদ্ধ করেন বটে, কিন্তু যে জিনিষ শ্রাদ্ধের মূল সেই শ্রদ্ধার সহিত করেন না, যেন একটা সামাজিক আচারবৎ শ্রাদ্ধ করেন। শ্রাদ্ধে, শ্রদ্ধার অভাবের মূল কারণ,—'শ্রাদ্ধে পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন,' 'পিতৃগণ তৃপ্ত হইলে শ্রাদ্ধকারীব মঙ্গল হয়,' এই সকল শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস। শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মশীল রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধকারীদের এই অবিশ্বাস ঘুচাইবার জন্য "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক উভয় প্রকার যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন এবং পিতৃগণ তৃপ্ত হইলে শ্রাদ্ধকারীর মঙ্গল হয়। আমরা প্রত্যেক হিন্দু-সন্তানকে এই "শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব" পড়িতে অনুরোধ করি।"

উন্নত সম্প্রদায়ের মুখপত্র "সময়ে"র মন্তব্য—

"শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সঙ্কলিত ও ৺ কাশীধামের ব্রাহ্মণ-সমাজ-রক্ষা সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য তিন আনা মাত্র। রাজা বাহাদুরের

পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, তিনি যেরূপ বনিয়াদীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সারাজীবন সেইরূপ বিদ্যাবুদ্ধিরও পরিচয় দিয়া দেশের কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য; তিনি এই পুস্তকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সকলের বোধগম্য করিয়া এ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছেন। যে পন্থা অবলম্বন করিলে আজ কালকার দিনে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সফল করা যাইতে পারে, রাজা বাহাদুর সম্যক তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার এই পুস্তকই তাহার প্রমাণ। হিন্দুত্বে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদিগকে আমরা এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

ব্রাহ্মণের সংবাদ পত্র "কাশীপুরী নিবাসী" হইতে উদ্ধৃত—

"শ্রাদ্ধতত্ত্ব—৺কাশীধাম-প্রবাসী রাজসাহী-তাহেরপুরের স্বনামধন্য শুদ্ধাচারী রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। রাজা বাহাদুর হিন্দুশাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করতঃ শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ কথা লিখিয়া হিন্দুসমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। * * * আমরা অনুরোধ করি বর্ত্তমান যুগে ঐ সকল পুস্তিকা সকলেই অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ করিবেন।"

কান্যকুব্জ প্রতিনিধি মহাসভার মুখপত্র "কান্যকুব্জ" হইতে উদ্ধৃত—

"इस पुस्तकका संकलन हिन्दुजाति, विशेषतः ब्राह्मणोंके उपकारके उद्देशसे किया गया है, अतः इसका मूल्य जहां तक कम हो सका है रक्खा गया है; और फिर भी हर एक हिन्दु-व्यक्ति तथा हिन्दु-समितिको अधिकार दे दिया गया है कि वह चाहे तो पुस्तकको मुद्रित तथा प्रकाशित करा और उसका लाभ किसी भी धर्म्मकार्य्यमें व्यय करे।"

সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী সাপ্তাহিক "ভারত জীবন" হইতে উদ্ধৃত—

'काशी-ब्राह्मणसभाके मंत्री द्वारा 'श्राद्धतत्त्व' नामक पुस्तक समालोचनार्थ हमें प्राप्त हुई है। इस पुस्तककी रचना ताहिरपुरके राजा शशिशेखरेश्वरराय बहादुरकी है। इस पुस्तककी समालोचना करना हम आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म और हिन्दू-समाजका रक्षक समझ हिन्दू मात्र होने जिन महापुरुषको अपने हृदयके उच्चस्थानमें बैठाया है, वही ऋषितुल्य राजा शशिशेखरेश्वर रायकी अमृतरूपी लेखनीसे जब यह पुस्तक लिखी गई है तब उसकी उपकारिताका परिचय देनेके लिये हमारी ओर से प्रशंसा करना व्यर्थ है। अन्तिम अवस्था प्राप्त रोगीको जीवन-रक्षाके लिये वैद्य जब औषधि देते हैं तो उस दवाका दोष-गुण रोगी नहीं विचार सकता। राजा शशिशेखरेश्वर राय धन्वन्तरि-भावमें अवतीर्ण होकर मृत्यु-दशामें उपस्थित हिन्दूसमाजकी जीवन-रक्षा करनेके लिये बहुत काम तक औषध देते हैं—यह श्राद्धतत्त्व उसी औषधका और एक मात्रा है; इसलिये हम उनकी

कृतज्ञता प्रकाश करते हैं परन्तु उक्त पुस्तककी समालोचना करनेकी हमारी इच्छा नहीं। राजा शशिशेखरेश्वर रायने इस से पूर्व और और पुस्तकें लिखकर मृतप्राय हिन्दुजातिको जीवित करनेका यत्न किया है। इस श्राद्धतत्त्व पुस्तकसे राजासाहब पितृलोगोंको पुनर्जीवित करना चाहते हैं। यह बात हम कह सकते हैं—क्यों नहीं, इस काशी नगरी में अनेक हिन्दू युवकोंने राजासाहबकी लिखी 'श्राद्धतत्त्व' पुस्तक पढ़कर पितृलोक है, इसपर विश्वास करके मृत पितामातोंका श्राद्ध करना आरम्भ कर दिया है। राजा शशि-शेखरेश्वर राय और कुछ दिन जीवित रहकर ध्वंस मुंहसे हिन्दू-समाजकी रक्षा करें ईश्वरसे इस समय हमारी एक मात्र यही प्रार्थना है। यद्यपि राजासाहब वृद्धावस्थाको प्राप्त हैं फिर भी लोकहित तथा ब्राह्मणोंके उपकारके हेतु पूर्ण परिश्रम कर अनेक पुस्तकोंकी रचना किया ही करते हैं। ऐसे उपकारी पुरुषको ईश्वर दीर्घजीवित करें।"

মৈথিল ব্রাহ্মণ সমাজের মুখপত্র "মিথিলা-মিহির" হইতে উদ্ধৃত—

"* * * हिन्दूमात्रके लिये यह पुस्तक संग्रह करने योग्य है। विषय पुस्तकके नामसे ही ऊहनीय है। ११२ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य ।≡) आने कुछ नहींके बराबर है। जो पितरोंके श्राद्धतत्त्वको जानना चाहें, वे इसे एक बार अवश्य पढ़ें।"

ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার উদ্যোগে ও আনুকূল্যে সঙ্কলিত শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পরকালতত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব, ত্রিসন্ধ্যাতত্ত্ব, দীক্ষাতত্ত্ব, শিবার্চ্চনতত্ত্ব, ত্রিতত্ত্ব, (ত্রিবিধ ধর্ম্ম-সাধনা-ব্যাখ্যান) আহ্নিকতত্ত্ব, শ্রীক্ষেত্রতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব, বৈদিক সংস্কারতত্ত্ব, আচার-তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহিলে, ঐ ঐ পুস্তকের বিষয়-সূচী সংযুক্ত বিজ্ঞাপনী দ্রষ্টব্য।

পরকালতত্ত্বের মূল্য ।৵০, ডাকমাশুল /০ ; রেজেষ্টারী ডাকে লইলে ৵০ অতিরিক্ত। ১০ খানা পরকালতত্ত্ব একযোগে লইলে ডাকব্যয় সহ মূল্য ৩৸০ আনা। ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার সহিত সহযোগিতা সম্বন্ধযুক্ত যে সকল ধর্ম্মসভা, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং পাঠাগার বিনামূল্যে উক্ত সভার পুস্তক পাইয়া থাকেন, তাঁহারা এক আনা ডাকমাশুলেই "পরকালতত্ত্ব" পাইবেন।

পরকালতত্ত্বের হিন্দি সংস্করণ ছাপা হইতেছে মূল্য ।৵০

এতৎসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে নাম ঠিকানাযুক্ত একখানি পোষ্টেল খাম বা রিপ্লাইকার্ড সহ কৃপাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত স্থানে পত্র লিখিবেন।

তত্ত্ব-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড্।
১নং পঞ্চক্রোশী রোড্,
নাগোয়া, কাশী।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা—
কার্য্যাধ্যক্ষ।